ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

গোপন

প্রেমের গল্প

গোপন প্রেমের গল্প

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

গোপন প্রেমের গল্প

পত্র ভারতী

www.bookspatrabharati.com

প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১২
দ্বিতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১৩

GOPON PREMER GOLPO
by
Tridib Kumar Chattopadhyay

ISBN 978-81-8374-174-3

প্রচ্ছদ এনভিসেজ
অলংকরণ সুদীপ্ত মণ্ডল

Publisher
PATRA BHARATI
3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
e-mail : patrabharati@gmail.com www.bookspatrabharati.com
visit us at www.facebook.com/ Patra Bharati

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্র ভারতী, ৩/১ কলেজ রো,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস,
১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখকের অন্যান্য বই

তুমি, পিতামহয় ভীষ্ম

জগুমামা রহস্য সমগ্র ১

ভয়ের আড়ালে ভয়

ভৌতিক অলৌকিক

রহস্যেঘেরা রাক্ষসখালি

অসি বাজে ঝনঝন

আরবি পুঁথির রহস্য

হেরে যাবেন জগুমামা?

আজও রোমাঞ্চকর

রহস্য রাতের পদ্মায়

রক্তরহস্য

লেখকের সম্পাদিত বই

শারদীয়া কিশোর ভারতী ১৩৭৫

শারদীয়া কিশোর ভারতী ১৩৭৬

কিশোর ভারতী সেরা সমগ্র

কিশোর ভারতী উপন্যাসসমগ্র

জঙ্গল অমনিবাস

সেরা জোকস ৪০১

সেরা পঁচিশ হাসির গল্প

সেরা পঁচিশ গোয়েন্দা গল্প

সেরা পঁচিশ হাসির গল্প

অপরূপ রূপকথা

ভয়ের গল্প ৫১

হাসির গল্প ৫১

সে এসেছিল...

প্রেম রহস্যময়। প্রেম উতল হাওয়া, প্রেম অতল সমুদ্র। প্রেম বয়েস, সময় কিছুই মানে না। কখন যে আসে, কেউ কি জানে! প্রেম বৈধ, প্রেম অবৈধ। পরকীয়া প্রেমের রোমাঞ্চই আলাদা।

শরীরবিহীন প্রেম? সে তো সোনার পাথরবাটি।

প্রেম কখনও উচ্চকিত নয়। সে বড় গোপন।

নানাবয়েসি নারী-পুরুষের নানামাত্রার প্রেম নিয়ে এই বই। লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল গত কয়েকবছরের বিভিন্ন শারদ-পত্রিকায়। প্রেমপিপাসুদের ভালো লাগলে খুশি হব।

শ্রদ্ধেয় দাদা প্রফুল্ল রায়ের নিরন্তর স্নেহ-তাগাদায় এই বই পরিকল্পনার সাহস পেয়েছি। তাঁকে প্রণাম।

১লা ডিসেম্বর ২০১২

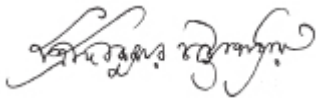

কলকাতা ৭০০ ০০৯

Tridib Kumar Chattopadhyay

জন্ম ৩০ অক্টোবর ১৯৫৮।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এসসি।

রহস্য, কল্পবিজ্ঞান এবং ইতিহাস-নির্ভর সাহিত্যে ইতিমধ্যেই পরিচিত।

২০০০ সাল থেকে বয়স্ক পাঠকদের জন্যও নানা গল্প-নিবন্ধ লেখা শুরু। নবকল্লোল, প্রতিদিন, মাতৃশক্তি, পুরশ্রী, প্রসাদ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত ও প্রশংসিত।

পত্র ভারতী থেকে প্রকাশিত বই জগুমামা রহস্য সমগ্র ১, বিষাক্ত রাত, ভয়ের আড়ালে ভয়, অসি বাজে ঝনঝন, আজও রোমাঞ্চকর, রহস্য রাতের পদ্মায়, সাক্ষী ছিলেন জগুমামা, নীল কাঁকড়ার রহস্য, রহস্যেঘেরা রাক্ষসখালি প্রভৃতি।

সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে সেরা সমগ্র কিশোর ভারতী উল্লেখযোগ্য।

১৮ বছর কিশোর ভারতী পত্রিকার সম্পাদক। ২০০৭ সালে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে সম্মানিত। এ ছাড়াও পেয়েছেন সরকারি, বেসরকারি নানা সম্মান ও পুরস্কার।

প্রচ্ছদ এনভিসেজ

সে এসেছিল...

প্রেম। সে নি:শব্দেই আসে। নরনারীর মধ্যে কী এক ম্যাজিকে ঘটে যায় মুহূর্তে। রচিত হয় তীব্র আকর্ষণ, মধুর আশ্লেষ।

কখনও বৈধ, কখনও পরকীয়া, কখনও ভাঙনের পরে...।

কখনও সে আমাদের হাসায়, কখনও স্তব্দ করে রাখে।

চুক্তি, গোপন রঙ্গ, ভূমিকম্প, সর্বনাশের সামনে থেকে শুরু করে ঝড়ের পরে, একা-একা, আরও একবার, গ্রিন কার্ড...বৈচিত্র্যে ভরা এমন ১৫টি গোপন প্রেমের গল্প দুই মলাটে এসেছে।

এ বই শুধু পড়ার নয়, ভালোবাসার জনকে গোপনে উপহার দেওয়ারও।

সূ চি প ত্র

চুক্তি

গোপন রঙ্গ

ভূমিকম্প

যেতে-যেতে

একা-একা

সর্বনাশের সামনে

পরশমণির খেলা

কেলেংকারি

গ্রিন কার্ড

অনুসরণ-রহস্য

অরিন্দমের রবিবার

ঝড়ের পরে

আলাপ

আরও একবার

জীবনের মানে

চুক্তি

এই যে ম্যাডাম, কী খবর? খুব টায়ার্ড?'

.....

'কী হল? কিছু বলো।'

'কথা বলতে ভাল্লাগছে না।'

'ভাল্লাগছে না! শরীর খারাপ?'

'না।'

'তবে? আজকের দিনে আমার সঙ্গে কথা বলতে তোমার ভালো লাগছে না? তোমার কী হয়েছে বলো তো?'

'এখনও কিছু হয়নি। কথা বললেই হবে। কথা থেকে শুরু হয়ে পরপর সব লাইন দিয়ে হয়ে চলবে।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'না বোঝাই ভালো।'

'স্ট্রেঞ্জ! অদ্ভুত। সোনা, আজকের দিনটা তো বারবার আসবে না। জীবনে ওনলি ফর ওয়ানস। এই দিনটা, মানে রাতটাতে তুমি বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকছ।'

'ওনলি ফর ওয়ানস কেন?'

'কী বলছ? ফুলশয্যা কি বারবার হয়? নাকি আমরা বারবার বিয়ে করব?'

'ফুলশয্যা ব্যাপারটাই বেশ বাজে। যদি তিনশো পঁয়ষট্টি দিন একসঙ্গে থাকি, তবে রোজই ফুলশয্যা হতে পারে।'

'আহা! সে তো হবেই। কিন্তু আজকের রাতটা তাই বলে... তোমায় এবাড়ির কেউ কিছু উলটোসিধে বলেছে নাকি?'

'না। তেমন ঘটার কোনও কারণ নেই।'

'তবে? ধুত্তেরি! বুঝেছি। আমার সঙ্গে মজা করা হচ্ছে! দাঁড়াও! তোমার মুখ গুঁজে থাকা আমি বার করছি। একটা টান—'

'খবর্দার! গায়ে হাত দিলেই চিৎকার করব।'

'চিৎকার করবে? অ্যাঁ!...কেন? কী করেছি?'

'এখনও কিছু করা হয়নি। কিন্তু করার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। একটু আলগা দিলেই...প্রথমে দুচারটে মিষ্টি কথা...তারপর জড়িয়ে ধরে...উ:! ভাবতেই শিউরে উঠছি।'

'শিউরে উঠছ? এই স্বাভাবিক ব্যাপারটাতে? ফুলশয্যার মধুরাতে স্বামী-স্ত্রী করবেটা কী? আদর না করে ঝগড়া করবে?

'সেটাই ভালো। ইনফ্যাক্ট, আমি ঝগড়া করতেই তৈরি আছি।'

'ঝগড়া করবে? আশ্চর্য! তোমার সঙ্গে গত দু-মাস ধরে ফোনে বকবক করে হাজার ডলার উড়িয়ে দিলাম, স্কাইপে চ্যাটিং করলাম, একটা কড়া কথাও তো বলো নি!'

'বলিনি। তার কারণ, তাহলে পাখি খাঁচা ছেড়ে পালিয়ে যেত। সত্যি কথাটা বলার জন্যে আমি মনে-মনে আজকের রাতটা বেছে রেখেছিলাম।'

'ওহ মাই গড! তুমি তো ডেঞ্জারাস মেয়ে। ঠিক আছে! বলো, শুনি তোমার ঝগড়ার কথা। আমায় তোমার পছন্দ হয়নি, তাই তো? সেটা আগে বললেই পারতে।'

'বলব কেন? মোটেই অপছন্দ হয়নি। এমন কার্তিকের মতো চেহারা, লেখাপড়াও অনেক দূর পর্যন্ত, না পছন্দ হওয়ার কি কোনও কারণ আছে?

'তবে? আমার আগের প্রেম? আগেই কিন্তু তোমায় আমি বলে দিয়েছিলাম, স্টেটসে গিয়ে পি.এইচ.ডি করার সময়ে সিলভেস্তা নামে একটা স্প্যানিশ মেয়ের প্রেমে পড়ে

গেছিলাম। মেয়েটা বেশ ভালোও ছিল। কিন্তু ওর সঙ্গে ক'মাস ডেটিং করার পরে দেখলাম, ইন লং রান, ব্যাপারটা ক্লিক করবে না। তখন সরে এসেছি।'

'জানি।'

'আমি তোমায় এটাও পষ্ট জানিয়েছি, সিলভেস্তার সঙ্গে ফিজিক্যালি অনেকটাই আমি এগিয়ে গেছিলাম। তবে হ্যাঁ, সিলভেস্তা ওদেশের তুলনায় কনজারভেটিভ ছিল। ওর মা ইন্ডিয়ান। আমাদের ফিজিক্যাল ইনভলবমেন্ট আলটিমেট এন্ড পর্যন্ত পৌঁছোয়নি। সেই অর্থে, আমি এতদিন স্টেটসে থেকেও কনফার্মড ব্যাচেলার।'

'ওসব নিয়ে আমি বদারড নই। যদি পাস্ট কোনও ইনসিডেন্স থেকেও থাকে, পাস্ট ইজ পাস্ট। আমার কলেজলাইফেও টুকটাক এসব ঘটেছে। ঘটতেই পারে।'

'তবে? আর কী করেছি আমি? দোষটা কোথায় আমার?'

'প্রোষিতভর্তৃকা মানেটা কি জানা আছে?'

'ক-কী বললে? কী ভর্তৃকা? শব্দটা, আই মিন ওয়ার্ডটা খুব চেনা-চেনা লাগছে। মনে হয়, ছোটবেলায় পড়েছি। বাট আয়াম স্যরি, বুঝতে পারছি না।'

'বা:! মাতৃভাষা বোঝা যাচ্ছে না! না পারলে বাংলা ডিকশনারি দেখে নেওয়া হোক।'

'কী বলছ? ফুলশয্যার রাতে বাইরে বেরিয়ে আমি ভাইপোর ঘরে গিয়ে ডিকশনারি খুঁজব? প্লিজ সুইটি!'

'আমার নাম কোয়েলি, সুইটি নয়।'

'জানি, জানি। কিন্তু নিজের বউকে আদর করে সুইটি ডাকতে পারব না?'

'উচিত নয়। কারণ, এটা এখনও কনফার্মড নয়, সে সুইটি না সলটি না বিটার। ঠিক আছে, মানেটা বলে দিচ্ছি। এই ফার্স্ট, এই লাস্ট। এরপর বাংলা অভিধান কনসাল্ট করতে হবে। রাজি?'

'রাজি।'

'প্রোষিতভর্তৃকা মানে হল যে স্ত্রীর স্বামী প্রবাসে অর্থাৎ বাইরে থাকে। আমি প্রোষিতভর্তৃকার জীবনযাপন করতে রাজি নই।'

'কেন তোমায়, ওই কী বলে, প্র-পোষিতভর্তৃকার জীবন কাটাতে হবে? আমি তো সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। আমি পনেরোদিন পরে ফিরে যাব। গিয়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন

সার্টিফিকেট সহ তোমায় স্পনসরশিপ পাঠিয়ে দেব। ব্যস, তুমি তিনমাসের মধ্যে স্টেটসে চলে আসবে আমার কাছে।'

'এত সোজা? গড়গড় করে বলে গেলেই হল? এই রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের কোনও ভ্যালু আছে আমেরিকায়? ওখানে গিয়ে এটাকে, আবার নোটারি পাবলিককে দিয়ে এনডোর্সড করতে হবে, সেটা জানা নেই?'

'জানি। ওটা কোনও প্রবলেম নয়। এজেন্টের সঙ্গে কথা বলে এসেছি। সার্টিফিকেটটা নিয়ে গেলেই ওরা করিয়ে দেবে।'

'হ্যাঁ—অ্যাঁ! গেলেই করিয়ে দেবে। পেন উঁচিয়ে বসে আছে করে দেওয়ার জন্যে! তাহলে আমার বেচারি টিনামাসিকে পাক্কা দেড় বছর বসে থাকতে হয়েছিল কেন?'

'টিনা মাসি? তিনি কে?'

'কে আবার! মায়ের খুড়তুতো বোন। আমার মাসি। সঞ্জয় মেসো এল, বিয়ে করল। হানিমুনে গেল দিঘায়। তারপর ম্যারেজ সার্টিফিকেট নিয়ে চলে গেল। স্পনসর পাঠাল। কিন্তু তাতে কী? আমেরিকার ভিসা কিছুতেই পাচ্ছে না। বলে কিনা, এদেশের বিয়ে ওদেশে বৈধ নয়।'

'তাই নাকি? তারপর?'

'তারপর...উ:! টিনামাসির কী কষ্ট। বাবা-মা থাকে বহরমপুরে, সে কলকাতায় ওয়ার্কিং গার্লস হস্টেলে। মেসো ডলার পাঠায়, তাতে তার খরচ চলে।'

'সঞ্জয় মেসো বোধহয় গ্রিন কার্ড হোল্ডার ছিলেন না!'

'কে বলল? পনেরো বছর স্টেটস-এ সফটওয়্যার এঞ্জিনিয়ার, তার গ্রিন কার্ড থাকবে না? মেসো তখন বুদ্ধি খাটিয়ে কোম্পানিকে বলে কানাডার টরন্টোতে ট্রানসফার নিল। সেখানে ছ'মাস কাটিয়ে নতুন করে কানাডা থেকে মাসির স্পনসর পাঠাল। কানাডার হাই কমিশন আমেরিকানদের মতো অত নিষ্ঠুর নয়। তারা তিন মাসের মধ্যে ভিসা গ্র্যান্ট করল। তারপর টিনা মাসি প্লেনে উঠল। বেচারি! সেই যে আটবছর আগে গেল, আজ পর্যন্ত একবারও দেশে আসতে পারেনি।'

'আসতে পারেনি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। এখন স্টেটসের গ্রিন কার্ড পায়নি। কারণ মেসোর সঙ্গে তাকে প্রায় সাতবছর কানাডায় থাকতে হয়েছিল। কোম্পানি তো মেসোর খেয়ালখুশিমতো আমেরিকা-

কানাডা-আমেরিকা ট্রান্সফার দেবে না! এইবার কানাডা থেকে যখন বছরখানেক আগে স্টেটসে ঢুকতে যাচ্ছিল, স্টেটস মেসোকে অ্যালাও করে দিল। মাসি আর তার ছোট্ট মেয়েটাকে কিছুতেই ইমিগ্রেসন দিচ্ছিল না। শেষে প্রায় বে-আইনিভাবে লুকিয়ে-চুরিয়ে ওরা নায়াগ্রা বর্ডার ক্রস করে ঢোকে। সে কী বিশ্রী আর ভয়ংকর ব্যাপার। মাসির কাছে ফোনে সব শুনে আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেছে। স্টেটসে পৌঁছে সঞ্জয় মেসো টিনামাসিকে ফের ওদেশিয় মতে বিয়ে করল, নিজের বাচ্চাকে অ্যাডপ্ট করল। সবে ছ'মাস হল পুরো প্রসেসটা লিগালাইজড হয়েছে। মাসি গ্রিন কার্ডের জন্যে ভেরি রিসেন্টলি অ্যাপ্লাই করেছে। গ্রিন কার্ড পেলে তবে বাচ্চা আর মাসিকে নিয়ে মেসো আসতে পারবে।'

'মাই গড!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। টিনামাসির কত ইচ্ছে ছিল, আমার বিয়েতে আসবে। পারল না।'

'তাতে কিন্তু কিছু যায় আসে নি। হ্যাঁ, গেট টুগেদার হইচই এসব মাসি মিস করেছে। তবে ওদের সঙ্গে দেখা হয়েই যাবে। একই দেশে তুমিও যাচ্ছ। বাই দ্য ওয়ে, মাসিরা কোন স্টেটে থাকেন?'

'বস্টন শহরে। ম্যাসাচুসেটস স্টেট তো?'

'হ্যাঁ। গ্রে হাউন্ডে নিউ ইয়র্ক থেকে মাত্র চার ঘণ্টা। উইক-এন্ডে গাড়ি নিয়ে চলে যাব।'

'যদি আমি অ্যাট অল যাই।'

'কী বলছ! তুমি স্টেটস যাবে না?'

'তাতো বলিনি। আমি একটাই কথা বলেছি, বিয়ের পরে প্রোষিতভর্তৃকা হয়ে থাকতে পারব না। যদি থাকতেই হয়, তবে যতদিন না আমি ওদেশে পৌছোচ্ছি, তদ্দিন নো ছোঁয়াছুঁয়ি। আমি ভার্জিন আছি, থাকব।'

'লে ব্বাবা! তুমি তো ব্ল্যাকমেইল করছ!'

'ব্ল্যাকমেল করছি? বলতে লজ্জা করছে না? আমার স্বামী বাহাদুর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ থেকে রাজপুত্তুরের মতো উড়ে এসে আমায় বিয়ে করলেন। তারপর আদরে-টাদরে আমায় অস্থির করে দিলেন। সিমলায় হানিমুনে বেড়াতে নিয়ে গেলেন। আমার শরীরে-মনে তখন সর্বত্র তিনি। পনেরো দিন পরে টা-টা বাই-বাই করে উড়ে গেলেন নিজের জায়গায়। আমি বসে-বসে আঙুল চুষব। কবে যেতে পারব, কবে আবার থাকতে পারব তেনার সঙ্গে, জানি না। না:! প্রশ্নই আসে না। টিনামাসিকে আমি দেখেছি। কী কষ্ট! শরীরে জ্বালা, মনে জ্বালা!'

'ক-কিন্তু আমি করবটা কী?'

'করণীয় এখনও বোঝা যায়নি? পষ্ট তো বলে দিলাম, আমায় সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।'

'উ: সুইটি, ইয়ে সরি কোয়েলি, কেন বুঝছ না, সেটা পনেরোদিনে সম্ভব নয়।'

'পনেরোদিনে না হলে একমাসে হবে। বর আছে এখানে, এটা বললে ভিসা সিওরলি অনেক তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে। এখানকার আমেরিকান কনসুলেট বিবাহিত বর এবং ম্যারেজ সার্টিফিকেট দেখলে আমায় নিশ্চয়ই কনসিডার করবে।'

'কিন্তু আমার চাকরিটা? সেটা যে চলে যাবে।'

'অত সোজা নয়। রিসেসনের সময়ে তিন বছরে যখন চাকরি যায়নি, উল্টে বছর-বছর দিব্যি মাইনে বেড়েছে, সে চাকরি এত সহজে যায় না! কোম্পানিও জানে, কার কত এফিসিয়েন্সি!'

'বা:, তুমি দেখছি আমার চেয়ে আমার চাকরি সম্পর্কে বেশি জান!'

'সেটা বলিনি। খোঁজখবর নিয়েছি, ওয়েবসাইটে গিয়ে কোন পোস্টে কাজ করা হয়, কত মাইনে এটুকু অন্তত: জেনেছি। যাকগে! আমার কথা আমি বলে দিয়েছি। ডিসিশন এখন উল্টোদিকের।'

'আরে ভাই, অমন করে বেঁকিয়ে-বেঁকিয়ে বলছ কেন?'

'সোজা আঙুলে ঘি উঠছে না বলে।'

'উ: বাবা! ক্ষ্যামা দাও। প্লিজ, একটু বুদ্ধি দাও। আমার মাথা কাজ করছে না।'

'এখন ওখানে কটা বাজে?'

'ও-ওখানে? এখানে রাত একটা। ওদেশ প্রায় দশ ঘণ্টা পিছিয়ে। তার মানে ওখানে দুপুর তিনটের আশেপাশে।'

'অর্থাৎ মিস্টার অভিজিৎ সানিয়ালের অফিস খোলা?'

'সিওর।'

'এখনই ল্যাপটপ থেকে একটা মেল করা হোক। বয়ানটা হোক, আমার বিয়ে-সংক্রান্ত বিষয়ে একটা কমপ্লিকেশনস হয়েছে। দুর্ঘটনাও লেখা যায়। আমার মতো বেয়াড়া বউ পাওয়া একরকম দুর্ঘটনা তো বটেই। নিরুপায় হয়ে আবেদন করছি, আমায় আরও এক মাস উইদাউট পে ছুটি মঞ্জুর করা হোক। উইদাউট পে আমি আগ বাড়িয়ে বললাম।

কারণ, যা এতদিন ইনকাম করা হয়েছে, একমাস না পেলে কিছু ক্ষতি হবে না। কোম্পানির ওপর চাপও পড়ল না। রাজি হয়ে যাওয়ার চান্স বাড়ল।'

'যদি রাজি না হয়? কোয়েলি, প্লিজ ভেবে দ্যাখো, ওদেশে চাকরি কিন্তু অত সস্তা নয়।'

'বউ খুব সস্তা বুঝি? এদেশ থেকে যখন খুশি মুঠো-মুঠো নিয়ে গেলেই হল। মেয়েটাকে দাগী করে, ফূর্তি লুটে চলে গেলাম, যেতে পারলে গেল, নাহলে গেল না! কী আসে যায়! ঠিক কি না?'

'ছি: ছি: ছি:। কীসব যাচ্ছেতাই বলছ।'

'বেশ। বলব না আর। এই আমি মুখ গুঁজলাম।'

'কোয়েলি! কোয়েলি! ঘুমিয়ে পড়লে?'

'না।'

'মেল পাঠিয়েছি। আশ্চর্য, রিপ্লাইও এসে গেছে।'

'এর মধ্যে এসে গেছে? নিশ্চয়ই রিফিউজ করেছে?'

'না।'

'ক-কী-? অ্যাকসেপ্ট করেছে? ছুটি স্যাংশন করেছে?'

'হ্যাঁ। শুধু তাই নয়। লিখেছে, 'প্লিজ টেক কেয়ার অফ য়োর ফ্যামিলি প্রবলেমস। উই'ল ওয়েট ফর য়োর জয়েনিং টু আওয়ার অর্গানাইজেন।'

'ইজ ইট ট্রু? কী বলছ? সত্যি?'

'ই-য়েস! এই দ্যাখো না—।'

'উ:—! আ-আমি পাগল হয়ে যাব! তুমি-তুমি এখানে থাকছ...আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি...'

'আরে, আরে—তুমি এরকম করছ কেন? বিহেভিং হিস্টিরিক? এতক্ষণ ভাববাচ্যে কথা বলছিলে—এখন...অ্যাই...এ কী! কথা বলতে বলতে...উম-উম!'

'উম-উম!...আর কোনও কথা নয়। আজ আমাদের ফুলশয্যা না? তোমায় আমি...এসো এসো-শিগগির!

'আরে আরে, টানছ...দ্যাখো...লাইটটা জ্বলছে যে।'

'জ্বলুক! জ্বলুকগে! যদি কেউ উঁকি দিয়ে দেখে, কী বলবে? বউটা বেহায়া...বলুক গে! আমার এখন...তোমাকে যে আমি...কী করব...'

'কী করবে...অ্যাই...আবার...ধুতি-টুতি...দ্যাখো...দ্যাখো...সব ইয়ে...'

'পাগল...পাগল করে দেব! শিগগির সুইটি বলো! ভ্যাবলাকান্ত কোথাকার! আমি যে তোমায় ছাড়া থাকতে পারব না, সেটা বুঝতে এতক্ষণ লাগল?'

'উম-উম-উ:-উ:...ঠোঁটটা এতজোরে চুষছ কেন সুইটি?...তুমি আমায় এত ভালোবেসে ফেলেছ...সত্যি?'

'না তো কী! মরলে তোমায় নিয়েই মরব। তোমায় আমি ছাড়ছি না।...শিগগির লাইট নেভাও।'

গোপন রঙ্গ

'রঞ্জিনী, আপনি...আপনি কোথায়? এসে গেছেন?'

'না। রাস্তা খুব জ্যাম। কাদের একটা প্রসেসন বেরিয়েছে। রাসবিহারির ক্রসিং-এ প্রায় আধঘণ্টা আটকে আছি। ট্রাফিক নড়ছেই না। সরি সোমক। দেরি হয়ে গেল।'

'না-না, এতে সরির কী আছে? এ কি কোনও কোম্পানি মিটিং নাকি? টেক য়োর টাইম। জাস্ট টু ইনফর্ম য়ু যে আমি পৌঁছে গেছি।

'ঠিক কোন জায়গাটায় আছেন?'

'রবীন্দ্রসদনের পরের গেটটা দিয়ে সোজা চলে আসবেন। বাঁদিকে রবীন্দ্রসদন, ডানদিকে নন্দন। শেষপ্রান্তে একটা বটগাছ। বাঁধানো বেদি। বড় ফাস্টফুড সেন্টার, পাশে কোক আউটলেট। প্রচুর লোকজন, ছেলেমেয়ে। ওখানেই। অপেক্ষা করছি আপনার। জানেন তো, সবুরে মেওয়া ফলে?'

'যা:! কী যে বলেন!...আচ্ছা, আপনার ড্রেস কোড কী? মানে ওই ভিড়ে আইডেন্টিফাই করতে—

'ও সিওর। ক্রিম ট্রাউজার, ব্ল্যাক সার্ট। কালারড স্পেকস। আপনি?

'তুঁতে সালোয়ার কামিজ, সাদা দোপাট্টা। সানগ্লাস।...এই রে! বৃষ্টি শুরু হল যে।'

'হ্যাঁ, এখানেও। তবে ডোন্ট ওরি। আকাশে মেঘ নেই, কমে যাবে। ভালোই হয়েছে, বুঝলেন! পুষ্পবৃষ্টি...আমাদের শুভদৃষ্টির। হা: হা:।'

'সোমক, আপনি...আপনি সাংঘাতিক লোক।'

'হা: হা:—চলে আসুন। মাই সুইটহার্ট।'

রঞ্জিনী ফোনটা কেটে দিল।

ফোনটা মুঠোয় ধরে সোমক নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে। শরীরের মধ্যে কাঁপুনি দিচ্ছে। হৃদপিণ্ড ধপ-ধপ করছে। হার্টবিট হঠাৎ বেড়ে গেল নাকি?

গত কয়েকমাস ধরে যে গোপন খেলায় মেতে উঠেছিল, আজ তার ফাইন্যাল রাউন্ড! সেই পঁচিশ বছর আগের বয়েসটা হঠাৎ যেন ফিরে এসেছে। সেই প্রথম দেখা, প্রথম রোমান্স।

একটু পরেই শুরু হবে দ্বিতীয় ইনিংস! কী বলবে সোমক, কী করবে?...এ খেলায় মাঠে নেমে তো পালিয়ে যাওয়া যায় না।

'স্যার, আপনি এখানে? 'ক্রস কানেকশন' দেখবেন নাকি?'

চমকে তাকাল সোমক। ওদের অফিসের সুপ্রিয়। সবে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়র পোস্টে ঢুকেছে। সঙ্গে বউ নিয়ে এসেছে।

ভ্যাবাচাকা খেয়ে 'না-হ্যাঁ' ঘাড় নাড়ল সোমক। উফ, মহা জ্বালা! একদণ্ড একা থাকার উপায় নেই। সেই 'অফিস' এসে জুটেছে।

'দেখে নিন স্যার। কাগজে ব্যাপক রিভিউ করেছে।'

এবারেও ক্যাবলার মতো হাসল সোমক। কাগজে একবার চোখ পড়েছিল বটে, তবে ওই পর্যন্তই। রঞ্জিনীকে নিয়ে ঢুকে পড়বে নাকি?

'ভাবছি।...টিকিট অ্যাভেলেবেল?'

'হ্যাঁ স্যার। ওই দিকে নন্দনের টিকিট কাউন্টার। ব্যালকনি এখনও খালি আছে।'

একপক্ষে এটাই ভালো। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালে যখন-তখন এর-ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। তার চেয়ে অন্ধকার হলে ঢুকে পড়া অনেক সেফ।

ব্যালকনির দুটো টিকিট কেটেই ফেলল সোমক। আবার এসে পুরোনো জায়গায় পায়চারি করছে। রঞ্জিনী এখনও নিশ্চয়ই পৌঁছতে পারেনি। তবে সুপ্রিয়কে আর দেখা

যাচ্ছে না। বাঁচা গেল।

কীভাবে যে ব্যাপারটা ঘটে গেল। একঘেয়ে জীবনে আচমকা যেন বিদ্যুৎচমক!

ছেলে ডাক্তারি পড়ছে ব্যাঙ্গালোরে। বাড়িতে ও আর মণিকা। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত অফিসের চাপ। সন্ধের পর ফিরে কুড়ি বছরের বাসি বউয়ের মুখ দেখতে-দেখতে চা-কফি খাওয়া। কোনও-কোনওদিন পার্টি বা বন্ধুবান্ধব জুটলে একটু মদ্যপান। তারপর ডিনার এবং বিছানা। মনোটোনাস লাইফ।

পরদিন সকাল আটটা থেকে ফের মেশিন চালু। সেই অফিস...মিটিং...ফাইল...। যত উপরে উঠেছে, তত কাজের চাপ বেড়েছে। আর্থিক স্বচ্ছলতা যে জীবনে একমাত্র সুখ নয়, হাড়ে-হাড়ে ও বুঝছে এখন।

মণিকাকেও ইদানীং সব সন্ধেয় বাড়িতে পাওয়া যায় না। মোবাইলে ফোন করলে শোনে, বন্ধুদের বাড়ি আড্ডা দিচ্ছে। কমপ্লেক্সের বউরা মিলে 'কিটি পার্টি' স্টার্ট করেছে।

ক্রমশ একঘেয়েমির ডিপ্রেসনে ভুগতে শুরু করেছিল। সেই সময়ে একদিন অফিসে কাজের ফাঁকে নেট সার্ফ করতে-করতে, কী মনে হল, ফেসবুক-এ অ্যাকাউন্ট খুলে বসল। সেখানে প্রোফাইলে নিজের সম্বন্ধে লিখল 'চল্লিশ বছর বয়েস। ভীষণ একাকী। গল্প করার সঙ্গিনী খুঁজছি।'

নাম, বয়েস, ঠিকানা যথারীতি ঠিকঠাক দেয়নি। ও জানত, কেউ দেয়ও না। শুনেছে, এমনও নাকি হয়, পুরুষরা মেয়ের ছদ্মবেশে ওখানে হাজির হয় 'চ্যাট' করতে।

'কী স্যার, যাবেন না? ছটা প্রায় বাজে। গেটে বেশ বড় লাইন পড়েছে।'

আবার! কোত্থেকে ঘুরপাক খেতে-খেতে সুপ্রিয় স-গিন্নি এসে হাজির।

মুখে স্মিতহাসি ফুটিয়ে ও জবাব দিল, 'তুমি যাও। লাইনে দাঁড়াও। আমার জুড়ি এখনও এসে পৌঁছোননি। আমরা তোমাদের লাইনে ঢুকে পড়ব।'

'স্যার, একটা কথা বলব? আমার বউ এইমাত্র বলছিল, তোমাদের স্যার তো দারুণ হ্যান্ডসাম দেখতে। বয়েস এক্কেবারে বোঝা যাচ্ছে না।'

'য-যা:! তুমি না—!' সুপ্রিয়র বউ লজ্জা পেয়ে গেছে।

'আরে, এতে লজ্জার কী আছে? আমাদের স্যার সবসময়েই হ্যান্ডসাম। উই আর জেলাস অব হিম। কিন্তু স্যার অফিসে এমন হোয়াইট ড্রেস পরে আসেন, মনে হয় ইচ্ছে করে বয়েস বাড়াতে চান। স্যার, একসকিউজ মি, আপনাকে আজ ফাটাফাটি লাগছে।'

'ও সুপ্রিয়, তুমি যাও তো! লাইনে দাঁড়াও। আমাদের জন্যে জায়গা রেখো।'

'ওকে স্যার।' সুপ্রিয়রা এগিয়ে গেল।

এদিককার ভিড়টা পাতলা হতে শুরু করেছে। এদিক-ওদিক তাকায় সোমক। না:, রঞ্জিনীকে দেখা যাচ্ছে না। ফোনের বোতাম টিপতে গিয়ে থমকে যায়, আর একটু দেখা যাক।

প্রোফাইলে নিজের 'বায়োডাটা' প্লেস করার তিন দিনের মধ্যে রেসপন্স এল। রঞ্জিনী। সে প্রোফাইলে লিখেছিল, 'আমার তিরিশ বছর বয়েস। স্বামী এখানে থাকে না। ছেলে বাইরে পড়ে। আমিও গল্প করতে, বন্ধুত্ব পাতাতে চাই।'

সেই শুরু গোপন খেলা। গত ছ'মাস ধরে একটানা সোমক আর রঞ্জিনী চ্যাটিং করে গেছে। অফিসের লাঞ্চ ব্রেকে কোনওক্রমে নাকেমুখে গুঁজে সোমক বসে পড়েছে ওর ল্যাপটপের সামনে। চেম্বারের বাইরে 'ডোন্ট ডিস্টার্ব' বোর্ড ঝুলেছে। রঞ্জিনীও জেনে গেছিল সময়টা। তাই তারও জবাব আসত চটপট। দুজনের ভালোলাগা, দুজনের জীবনযাপন সব লিখেছে অকপটে।

এইভাবে চলতে-চলতে সাহস বেড়েছে। আর অরকুট-চ্যাটিং ভালো লাগত না। পার্সোনাল মেলে চলতে শুরু করল চিঠির আদানপ্রদান। মাস দেড়েক আগে সোমক আরেকটু সাহসী হয়ে লিখল, 'শুধু লেখায় মন ভরছে না।' কথা বলার সুখ পেতে অত:পর দুজনের মোবাইল নাম্বার এক্সচেঞ্জ হল। এরজন্য সোমককে নতুন একটা সেট ও নাম্বার কিনতে হয়েছে।

কিন্তু এতটা এগোবার পরও কেউ কাউকে ফোটো পাঠায় নি। কারণ, গোড়ার দিকে সোমক একবার কথাটা তুলতে রঞ্জিনী বলেছিল, 'না। ফোটো নয়। দুজনের মধ্যে সম্পর্ক যখন ততটা ঘনিষ্ঠ হবে, তখন নিজেরাই দেখা করব। তদ্দিন না-দেখার উত্তেজনা, কৌতূহল থাকা ভালো। সামনা-সামনি আলাপের রোমান্সই আলাদা।'

সোমক অভিভূত হয়ে গেছিল। রঞ্জিনীর পার্সোন্যালিটি, কালচার, ডিগনিটি এত স্ট্রং। মনে-মনে তুলনা করেছিল বউয়ের সঙ্গে। দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল। নাহ, মণিকা না হয়ে রঞ্জিনী যদি ওর লাইফ-পার্টনার হতো, তাহলে হয়তো ওকে এতটা লোনলি হতে হতো না।

অবশেষে গ্রিন সিগন্যাল এসেছে। সেই দিনটা আজকে। কিন্তু এত দেরি করছে কেন রঞ্জিনী? বৃষ্টি কতক্ষণ থেমে গেছে। ছ'টা বেজে গেছে। নন্দন চত্বরের হ্যালোজেনগুলো হলুদ আলোর বন্যা ছড়াচ্ছে।

হাতের মুঠোয় নন্দন ইভনিং শোর দুটো টিকিট! জ্যাম কি এখনও ছাড়েনি? অস্থিরভাবে চারিদিকে তাকাতে থাকে সোমক।

এইসময় মোবাইল।

'হ্যাঁ, রঞ্জিনী? কী ব্যাপার? আপনি কোথায়? এখনও পৌঁছতে পারেননি?'

'পৌঁছে গেছি। চত্বরে ঢুকেও পড়েছি। কিন্তু...'

'কিন্তু?'

'কিন্তু এগোতে গিয়েও আর এগোতে পারছি না।'

'কেন?'

'আপনাকে ঠিক লোকেট করতে পারছি না। তাছাড়া যে জায়গাটা আপনি বলেছেন, ওখানে আমার এক পরিচিত মানুষ ঘোরাঘুরি করছেন, দেখতে পাচ্ছি। সোমক, প্লিজ একটা কাজ করবেন?'

'বলুন না!'

'আপনি ওখান থেকে বেরিয়ে আসুন। সোজা হেঁটে পেপসি আউটলেটের পরে যে ট্রাইজাংশন পয়েন্টটা আছে, সেখান থেকে ডানদিকে রবীন্দ্রসদনের পাশ ঘেঁষে চলে আসুন। একটু এগোলেই ডানদিকে ছোট মাঠটায় ঢোকার মুখে দেখবেন, রেলিং-এর পাশে বেদি রয়েছে। অনেকে বসে আছে। একটু অন্ধকার মতন। আমি ওখানেই চলে এসেছি। একটু কষ্ট করে আসবেন?'

'সিওর!'

'আসলে এই জায়গাটা চুজ করা আমাদের ভুল হয়েছে। এত চেনা-পরিচিত লোকজন ঘুরে বেড়ায়...আমার তিনজন পুরোনো কলেজ ফ্রেন্ডের সঙ্গে দেখা...তারা এমন শুরু করেছিল...রবীন্দ্রসদনে নৃতনাট্য দেখতে এসেছে...অতি কষ্টে তাদের ছাড়িয়ে...'

'ঠিকই বলেছেন। আমাকেও অফিসের এক জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ধরেছিল। ওর পীড়াপিড়িতে বাধ্য হয়ে নন্দনের দুটো টিকিট কেটে ফেলেছি। ভেবেছিলাম দুজনে...যাক গে, ওসব থাক। আমি পৌঁছে যাচ্ছি।'

কথা বলতে-বলতে হনহন করে হাঁটছে সোমক। এতদিনের প্রতীক্ষা মাঠে মারা যাবে?

বাঁ দিকে রবীন্দ্রসদন, ডানদিকে ছোট মাঠে ঢোকার পথ। পাশে একটা দামদুরুশ ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। দুদিকে রেলিং-এর পাশে বাঁধানো বেদি। নানাবয়েসি ছেলেমেয়ে, পুরুষ-মহিলা ঘনিষ্ঠভাবে বসে আছে। গুজগুজ ফিসফাস চলছে।

তুঁতেরঙা সালোয়ার-কামিজ কোথায়? আবছা আলোতে একাধিক মনে হচ্ছে। টেনশনে সোমক ক্লালার ব্লাইন্ড হয়ে গেল নাকি?

একটা ফোন মারবে নাকি? উঁহু। এখানে যা নিবিড় পরিবেশ, ছন্দ কেটে যাবে। গালাগালও খেতে হতে পারে।

সোমক বিভ্রান্ত। একটু সরে আলোর নিচে গিয়ে দাঁড়াল। রঞ্জিনী ওকে দেখতে পেয়ে নিশ্চয়ই উঠে আসবে।

হ্যাঁ, উঠে এল। তবে রঞ্জিনী নয়। সোমক ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছে।

'কী ব্যাপার? তুমি এখানে? একা-একা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে করছটা কী? কাকে খুঁজছ?'

'ক-কাকে খুঁজব? এ-এমনি এ-এ-সেছি।'

'এমনি এসেছ? অফিস ফেরত বাড়ি না ফিরে এই চত্বরে ঘুরঘুর করছ এমনি-এমনি?'

'ক-কী মুশকিল! এই জায়গাটা আমার খুব ভালো লাগে। মাঝে-মাঝে তাড়াতাড়ি বেরোতে পারলে অফিস ফেরত এখানে ঘুরে যাই। তাছাড়া শুনেছিলাম, নন্দনে একটা ভালো ছবি এসেছে। তাই—'

'হ্যাঁ। হাতে টিকিটও রয়েছে দেখছি। কিন্তু নন্দন তো ওদিকে। এদিকে এসেছো কেন?'

'আরে! তুমি দেখছি পুলিশের মতো জেরা শুরু করলে! ...আচ্ছা, যদি আমি বলি, তুমি এসেছো কেন, অ্যাঁ? এরকম সেজেগুজে? জম্মে তো তোমায় এরকম ড্রেস পরতে দেখিনি।'

'আমি বন্ধুদের সঙ্গে রবীন্দ্রসদনে ঢুকব। নৃত্যনাট্য আছে। কেন, সাজলে আমায় খারাপ লাগে?'

'না, তা নয়। তবে—'

'তবে কি? নিজের দিকে তাকিয়ে দেখেছ? কবে বানালে এসব প্যান্ট-সার্ট? জম্মে সাদা ছাড়া তোমায় পরতে দেখিনি। আরে! চুলে রংও করেছ। উহুঁ! একটা কিছু ব্যাপার ঘটেছে। বলে ফেলো।'

দরদর করে ঘামছে সোমক। এইভাবে যে 'কট রেড হ্যান্ডেড' হয়ে যাবে, দু:স্বপ্নেও ভাবেনি। কাছেপিঠে রঞ্জিনী নিশ্চয়ই আছে। সে কি ওর দুর্দশা দেখতে পাচ্ছে?

এবার অপরপক্ষের গলা আরও একটু চড়ল, 'শোনো তাপস! তোমার কোনও ব্যাপারে আমি নাক গলাই না। কিন্তু গত কয়েকমাস ধরে দেখছিলাম, তুমি অন্য এক জগতে ডুবে আছ। ভাবতাম, অফিসের চাপ। সারা দিনে একটা-দুটোর বেশি কথা বলতে না।...দেখি, দেখি।'

বলতে-বলতে সোমক ওরফে তাপসের হাত থেকে টিকিট ছিনিয়ে নিয়েছে, 'আরে! এ তো দুটো টিকিট। তার মানে তুমি সঙ্গে কাউকে নিয়ে নন্দনে ঢোকার প্ল্যান করছিলে?

না:! এটা বোকামি হয়ে যাচ্ছে। এখন যত তর্ক করবে, তত ও জালে জড়িয়ে পড়বে। আর কথা নয়। চুপচাপ শুনে যেতে হবে। আজ যা ঘটে গেল, এর জল যে কতদূর গড়াবে, ভাবতে শরীরের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে।

'কী হল, চুপ করে গেলে যে?...আরে সত্যি কথাটা বলেই ফেলো না। কোন বন্ধুনির জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলে? ডাকো তাকে। আলাপ করি। দেখো তাপস, আমি অত মিন মাইন্ডেড নই। আমাদের অন্য কারও সঙ্গে মিশতে ভালো লাগতেই পারে। এতে অন্যায় কিছু নেই। প্লিজ, শুধুমুদু মিছে কথা বোলো না।'

ওর গলার স্বরে এমন একটা কিছু ছিল, তাপস খানিকটা ধাতস্থ হল।

'ডাকব? তুমি...তুমি...অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই পারব। বলছি তো। দেখি, সে আমার চেয়ে কতটা আলাদা।'

একটা খোঁচা! সে থাক, যখন আবরণ সব খুলেই গেছে, আর ভয় কি? কীসের লজ্জা?

তাপস মোবাইলে বোতাম টিপল।

বাজছে...বাজছে!

পরক্ষণে দুজনেই চমকে উঠল। মোবাইলটা বাজছে মণিকারই হাতে।

'মানে! এর মানেটা কী? তুমি...তুমি রঞ্জিনী! এই কয়মাস তুমি আমায় ধোঁকা দিয়ে হাবিজাবি কথা লিখে গেছ? ফোনে দু:খের কথা শুনিয়েছ?'

'আর তুমি? তুমি সোমক? তোমার বউ থেকেও নেই? সে সোসাইটি লেডি? ছি: ছি:, তুমি নিজের বউ সম্পর্কে এসব বলতে পারলে?

'তুমি যেন অজস্র সত্যি কথা লিখেছ! তোমার স্বামী, মানে আমি এদেশে থাকিই না! কখনও-সখনও চিঠি লিখি। টাকা পাঠিয়েই দায়িত্ব খালাস? গত দশ বছর কোনও সম্পর্ক নেই আমার সঙ্গে?

'আর তোমার বয়েস? চল্লিশ? কী অভিনয়! গলাটাও নরম-সরম করে রাখতে, অ্যাঁ? কচি খোকা?'

'তুমি তো তিরিশের ডগডগে খুকি? খুকি-খুকি গলা? তাই না?'

'মোটেই না। আমি যা, সেইভাবেই কথা বলেছি। তুমি নেশায় ছিলে, বুঝতে পারোনি।'

হঠাৎ তাপসের সব টেনশন নেমে গেল। ওরা খামোকা ঝগড়া করে যাচ্ছে। রঞ্জিনী নামক কাল্পনিক মেয়েটির সঙ্গে তার দেখা হল না! হবেও না কোনওদিন। একেই কি বলে গ্রহের ফের? নাকি বিধাতার গোপন খেলা?

সে হো-হো করে হেসে উঠল।

'তুমি হাসছ?'

'হাসব না? হাসছি তোমার করুণ অবস্থা দেখে। স্বামীকে ধরে ফেললে 'একস্ট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার্সের চার্জ'-এ। আর একইসঙ্গে নিজেই ফেঁসে গেলে একই চার্জে, তারই সঙ্গে। মাঝখান থেকে আমরা দুজনেই বয়েস কমাতে গিয়ে ঝাঁ-চকচকে হয়ে গেলাম।'

মণিকা কয়েকমুহূর্ত চুপ। তারপর সেও হেসে ফেলল।

'বুঝলে, এসব আমাদের জন্য নয়। ধেৎ! এত কষ্ট করে বিউটি পার্লার গিয়ে আমার এতসব সাজগোজ ফালতু হয়ে গেল।'

'কিছুই ফালতু হয়নি। আজ তুমি রঞ্জিনী, আমি সোমক। চলো, আগে সিনেমাটা দেখি। সবে বোধহয় শুরু হয়েছে। তারপর অবশ্য বাড়ি ফিরছি না। বাইরে কোথাও খেয়ে কোনও ভালো হোটেলে রাত কাটাব। সেখানে নো তাপস, নো মণিকা। এনট্রি বুকে লিখব, সোমক অ্যান্ড রঞ্জিনী।... ঠিক হ্যায়?'

ভূমিকম্প

অসীম হোটেলের লনে দাঁড়িয়ে ঘনঘন ঘড়ি দেখছিল। সিগারেটে টান দিচ্ছিল। কী হল বুলার? স্নান করতে এতক্ষণ লাগে! প্রচুর বাতিক আছে ওর। রোজ সাতসকালেই স্নান করা চাই।

বেরোনোর কথা সাতটায়। এখন পৌনে আটটা। পয়তাল্লিশ মিনিট লেট। কলকাতা পৌঁছতে কম করে আড়াই ঘণ্টা। মাঝে রাস্তায় থামলে আরও আধঘণ্টা। তার মানে এগারোটা-সাড়ে এগারোটার আগে বাড়ি ঢোকা যাচ্ছে না। এর ওপর পথে যদি কোনও গড়বড় হয়, তো হয়ে গেল।

ঠিক এইসময় চুল ঠিক করতে-করতে বুলা বেরিয়ে এল। কাঁধে ছোট্ট ব্যাগ।

—যাও। রেজিস্টারে সই করে এসো।

অসীম গাড়ির লক খুলে দ্রুতপায়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

—কই, কোথায় সই করতে হবে?

—এই যে স্যার।

রুম নম্বর ১০১। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস এ. মুখার্জি। পেমেন্ট আগেই হয়ে গেছে। সই করেই অসীম ছুটল গাড়ির দিকে।

নন্দকুমার পর্যন্ত রাস্তা মোটামুটি। খানিকটা আঁকাবাঁকা। তারপরেই বম্বে রোড। স্বর্ণ চতুর্ভুজ-এর টাকায় অবিশ্বাস্য চওড়া হাইওয়ে।

টাটা ইন্ডিকা ছুটছে পাখির পালকের মতো। মেঘলা আকাশ। ঠান্ডা-ঠান্ডা আবহাওয়া। তবুও কাচ তুলতে হয়েছে। এসি চালাতে হয়েছে। বুলার জন্যে। ওর চুল এলোমেলো হয়ে যাবে।

স্পিডোমিটার একশো ছুঁয়েছে। ফাঁকা চার লেনের রাজপথ। একপাশ দিয়ে লরি যাচ্ছে। হর্ন দিলেই সরে যাচ্ছে। এত মসৃণ পথ, গাড়ি এতটুকু কাঁপছে না। ঠিক বিদেশের মতো।

দুপাশে ছবির মতো সরে যাচ্ছে আদিগন্ত সবুজ। মাঝে-মাঝে বাড়ি-দোকান-ধাবা।

—মাঝে থামবে তো, নাকি?

—কেন?

—সে কি গো! শুধু চা-বিস্কুট খেয়ে বেরিয়েছি। ব্রেকফাস্ট করব না?

—এর মধ্যেই খিদে পেয়ে গেল?

—এখনও পায়নি। পাবে তো!

কী জানি, কী করে যে খিদে পায়!—অসীম উদাসগলায় বলল,—রাতে অত খেলে, তাতেও পেট ভরেনি?

—মানে?

এখনও মানে বুঝিয়ে বলতে হবে?—হাইওয়ের ওপর চোখ রেখে অসীম ফিক করে হাসল,—চেটেপুটে দুজনে খেলুম, এতক্ষণ ধরে...দু-দুবার...

মারব এক থাপ্পড়!—মুহূর্তে বুলা লাল হয়ে গেছে,—অ-সভ্য একটা। মুখের কোনও আগল নেই।

—কোনও কিছুরই নেই! বয়েস তো কিছু কম হল না। ধরে রাখাটাই আসল ম্যাজিক।...বুলা, একটা গান গাও।

—ধ্যুর! খিদে পাচ্ছে। এখন গান? দাঁড়াও, টেপ চালিয়ে দিচ্ছি।

—দরকার নেই। তোমার পাচ্ছে খিদে, আমার হচ্ছে টেনশন!

—তোমার টেনশন? কীসের?

—তুমি কী করে বুঝবে? তুমি তো চাবি খুলে ফাঁকা ফ্ল্যাটে ঢুকবে। কেউ জিগ্যেসও করবে না। বর ঘুরছে সমুদ্রে, মেয়ে হস্টেলে। আমার অবস্থাটা ভেবেছো?

—তোমার ছেলেও তো ব্যাঙ্গালোরে।

—ছেলের মা আছে না! সে তো জানে, আমি দিল্লি থেকে মর্নিং ফ্লাইটে ফিরছি। জেটের নাইন ডব্লিউ ফ্লাইট। এগারোটায় নামবে। সাড়ে এগারোটা থেকে মোবাইলে ফোন শুরু করবে। 'তুমি কোথায়?...নেমেছো?'...

—এগারোটা থেকে মোবাইল সুইচ অফ করে রাখবে। প্রতিভা ভাববে, তুমি প্লেনেই আছ। ফ্লাইট লেট করেছে।

—সে তো রাখবই। কিন্তু রিস্ক ফ্যাক্টরটা ভাবো? যদি দমদমে ফোন করে শোনে, ফ্লাইট রাইট টাইমে নেমেছে, তখন?

—দূর! ওর খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই! ওটুকু রিস্ক তো থাকবেই। রিস্ক না থাকলে মজা কোথায়, অসীম? বোরিং ভেজিটেটিভ লাইফ।

বলতে-বলতে বুলা সামান্য গম্ভীর হয়ে গেল। বলল,—তোমার কি মনে হয়, প্রতিভা কিছু আঁচ করতে পারে না? প্রায় প্রতি সপ্তাহে তুমি অফিসের কাজে দিল্লি-বম্বে যাচ্ছ। ঠিক উইক এন্ডে! ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য?

—বিশ্বাসযোগ্য কিনা জানি না। তবে ওর হাবেভাবে সন্দেহের সাপ এখনও দেখিনি। হয়ত বুঝেও না বোঝার ভান করে। কোনওদিন হাতেনাতে ধরে ফেলবে। তখন—

অসীম চুপ করে যায়। গাড়ি ছুটে চলেছে নি:শব্দে। একই গতিতে। একটা পেট্রল পাম্প।

—চলো। পেট্রল পাম্পের সঙ্গে নতুন মোটেল খুলেছে। এখানেই খেয়ে নেব। তেলও ভরে নেব ফুলট্যাঙ্ক।

মিনিটখানেকের মধ্যেই ইন্ডিকা ঢুকে পড়ল পাম্পের বিশাল চত্বরে। রেস্টুর্যানন্টের গায়ে গাড়ি পার্ক করে দুজনে নেমে এল। অসীম চাবি নিয়ে ইশারায় ডাকল উর্দিপরা একটি কর্মীকে। ততক্ষণে বুলা ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

—কী খাবে, বলো?

—তুমি যা খাবে।

—ঠিক বুঝতে পারছি না, কোনটা নেব। অনেকরকম আইটেম দেখছি।

—এখানেও রিস্ক ফ্যাক্টর বুলা! তবে আমার অভিজ্ঞতা বলে, অচেনা খাবারের জায়গায় বেশি হেভি কিছু নেওয়া ঠিক না। স্যান্ডউইচ-পকোড়া এগুলো বরং সেফ।

'জনাবে আলি!...জনাবে আলি!...জনাবে...'

বিকট বাজনার শব্দে দুজনেই চমকে তাকাল। রেস্টুর্যাতন্টের গা ঘেঁষে এসে থেমেছে একটা টাটা সুমো। স্টিরিও বাজছে। দরজা খুলে নেমে এল একদঙ্গল যুবক। আট-নজন। প্রত্যেকেরই বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশের মধ্যে।

ধপাধপ এসে বসে পড়ল সামনের খালি চেয়ার টেবিলে। কয়েকজন আবার বাথরুমের দিকে গেল কাঁধে তোয়ালে ফেলে।

অসীমের অস্বস্তি শুরু হয়েছে। দু-তিনজন হ্যাংলার মতো তাকিয়ে আছে বুলার দিকে।

—কী খাবি, তাড়াতাড়ি অর্ডার দে। এখানেই ন'টা বাজল, দিঘা পৌঁছতে-পৌঁছতে বিকেল হয়ে যাবে। তখন আঙুল চুষতে হবে।

—হ্যাঁ বস! শ্লার অ্যাকসিডেন্টটা দেখতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল মাইরি।

—তখনই বললুম! তোদের 'ইয়ের' তো শেষ নেই। ফালতু ফূর্তিবাজি কেস! হরবখত হচ্ছে। মালমুল খেয়ে চালাবে! গাড়িতে যেতে-যেতে ছোঁক-ছোঁক করবে! হবে না?

—তুমি সিওর, স্বামী-স্ত্রী নয়?

—হান্ড্রেড পার্সেন্ট নয়। লোকটা তো ফুটে গেছে! মেয়েছেলেটা কেমন নখরাবাজি করছিল পুলিশের কাছে, বলতে চাইছিল না, দেখলি না? এসব আমার ঘাঁটা আছে।

বুলা অদ্ভুতচোখে তাকাল অসীমের দিকে। অসীম চোখ সরিয়ে বলল,—তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

ওদের কথোপকথন চলেছে।

—আরে শ্লা, এখন এটাই হাইসোসাইটির ট্রেন্ড! এডস-এর ভয়ে আর রেড-লাইটে যায় না। বউগুলোও উপোসী। এ-ও-তার সঙ্গে লটকে যাচ্ছে। খুল্লমখুল্লা। সবাই সব জানে।

—হ্যাজব্যান্ড অ্যালাউ করে?

—তুই শ্লা মদন একটা! করবে না কেন? সে-ও তো আরেকজনের মাল তুলে ফূর্তি করছে। স্রেফ একসচেঞ্জ! আরে বুরবক, কম্পানিগুলো অ্যাড দেয়, দেখিসনি? পুরোনো

পালটে নতুন নিন। সে আর পাবে কোথায়! তাই মিউচুয়াল একসচেঞ্জ। এ সব অবশ্য আমাদের মিডলক্লাসে হয় না। আমাদের সব নেকুমুনু! সতী-সাবিত্রী মাইরি!

ওদের কথাগুলো যেন সর্বাঙ্গে হুল ফোটাচ্ছিল। কোনওরকমে চা গলায় ঢেলে দুজনেই উঠে পড়ল।...

গাড়ির মধ্যে জমাট নৈ:শব্দ্য। সব কথা হঠাৎ হারিয়ে গেছে। মৃদু শব্দে এসি চলছে। অসীম স্টিয়ারিং ধরে পাথরের মতো বসে আছে সামনের দিকে দৃষ্টি মেলে।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কলকাতা পৌঁছতে হবে। ভালো লাগছে না, কিচ্ছু ভালো লাগছে না।

কোলাঘাট ব্রিজ পেরোনোর মিনিট পাঁচেকের মধ্যে দূর থেকেই চোখে পড়েছে জায়গাটা। জনা তিনেক পুলিশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট্ট মারুতিটা দুমড়ে-মুচড়ে কাত হয়ে আছে রেলিঙের গায়ে। নিশ্চয়ই স্টিয়ারিং-এর উপর কন্ট্রোল ছিল না।

ওরাও তার মানে, কলকাতাতেই ফিরছিল? সাতসকালে চলন্ত গাড়ির মধ্যে...ধ্যুৎ! ফালতু কীসব ভাবছে! নিজেকেই নিজে গালাগাল দিল অসীম।...

কোনা এক্সপ্রেসওয়ের মুখে একটু জ্যাম। ক'দিনের বৃষ্টিতেই রাস্তার ছালচামড়া উঠে গেছে। বিদ্যাসাগর সেতুতে উঠে কবজি দেখল অসীম। সাড়ে এগারোটা। যাক, এসে গেছি। আর বড়জোর হাফ-অ্যান আওয়ার।

পাশে বুলার কোনও সাড়াশব্দ নেই। আড়চোখে দেখল। ঘুমোচ্ছে। বেচারি! ধাক্কা সামলাতে পারেনি।

সল্টলেকে বুলার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল ইন্ডিকা। গাড়িটা বুলার হাজব্যান্ডের। এখানে গ্যারাজ করে ট্যাক্সি নিয়ে ছুটতে হবে নিজেদের ফ্ল্যাটে। আলতো করে বুলার গালে টোকা দিল অসীম।

—ওঠো। এসে গেছি।

ভি. আই. পি. রোডের ওপর অসীমের ফ্ল্যাট। ক্লাব-টাউন কমপ্লেক্স। ট্যাক্সি নিয়ে ভেতরে ঢুকল সাড়ে বারোটায়।

একটু অবাকই লাগছে অসীমের। বারোটায় মোবাইল চালু করেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রতিভার ফোন এল না! এরকম কখনও হয়নি। তবে কি ও বুঝে ফেলেছে?

মনে-মনে কাঁটা হয়ে ব্যাগ ঝুলিয়ে নামল। উত্তরগুলো দ্রুত সাজিয়ে নিচ্ছে।

লিফটের সামনে দাঁড়াল। গেট থেকে সিকিওরিটির লোকটা ছুটে এসেছে।

—সার! আপনার চিঠি।

—আমার চিঠি? উপরে দাওনি?

—ম্যাডাম দিয়ে গেছেন। ওপরে কেউ নেই সার।

—অ।

সাদা কাগজে তিন লাইনের চিঠি। প্রতিভার লেখা।

'দিদির বাড়ি যাচ্ছি। কাল তোমার আগেই ফিরব। তবু যদি কোনও কারণে আটকে যাই, চিন্তা করবে। তাই জানিয়ে গেলাম।'

তাই বলো! এইজন্যেই মোবাইলে ফোন আসেনি। দিদির বাড়ি মধ্যমগ্রামে। সেখানে আড্ডায় জমে গেছে। অসীমের কথা মনে পড়েনি।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। ও:, যা টেনশন হচ্ছিল! ওই অ্যাক্সিডেন্টটা আজ মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে। ফেরার জার্নিটাই মাটি। ছেলেছোকরাগুলোও মহা হতচ্ছাড়া। মুখের ভাষা পুরো নর্দমা!

স্নান-টান সেরে পাজামা-পাঞ্জাবি গলিয়ে ঢুকল রান্নাঘরে। এককাপ চা বানিয়ে এসে সোফায় এলিয়ে বসল। টিভি চালিয়ে দিল। সিগারেট ধরাল। কী আরাম!

কখন তন্দ্রা এসে গিয়েছিল, জানে না। আরে! দুটো বাজে। ধড়মড় করে উঠে বসল অসীম। কী ব্যাপার? প্রতিভা এখনও ফিরল না। খেয়ে ফিরবে? অদ্ভুত মহিলা! একটা ফোন করে জানাবে তো। কোথায় কী রাখা আছে, অসীম কিছুই জানে না।

অসীমের খিদে পাচ্ছে। একটু-একটু করে রাগও চড়ছে। ফোনের পাশের ডাইরি থেকে নাম্বার বের করল।

—হ্যালো। কে বড়দি? আমি অসীম বলছি।

—আরে, অসীম! বলো, কেমন আছ?

—এই চলে যাচ্ছে। ওকে দিন। আছে, না বেরিয়ে পড়েছে?

—কার কথা বলছো?

—সবসময় ঠাট্টা ভালো লাগে না দিদি। আপনার বোনের কথা বলছি। আমার বউ। হয়েছে?

—কী বলছো? প্রতিভা তো এখানে আসেনি।

—হোয়াট? প্রতিভা কাল চিঠি লিখে গেছে, আপনার বাড়ি গেছে। আমি দিল্লি থেকে ফিরে পেলাম।

—সে কী কাণ্ড অসীম? সর্বনাশ! দু-চারদিন আগে ফোনে অবশ্য বলেছিল, একদিন আসবে। কিন্তু—

মোবাইল ফোনটা হঠাৎ বাজতে শুরু করেছে।

—দিদি, আরেকটা ফোন এসেছে। পরে—

—অসীম শোনো, থানা-হাসপাতাল—

অসীম ফোন নামিয়ে ছুটেছে শোবার ঘরে। খাটের ওপর থেকে মোবাইল তুলে নিয়েছে।

—হ্যালো।

—নমস্কার। অসীম মুখার্জি বলছেন?

—হ্যাঁ, বলুন। কে বলছেন?

—প্রতিভা মুখার্জি আপনার স্ত্রী?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। কী হয়েছে প্রতিভার?

—বলছি, বলছি। একটু শান্ত হোন। আমি ভবানীভবন থেকে বলছি। আজ সকালে বম্বে রোডে একটা ফ্যাটাল অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। মারুতি স্টিয়ারিং কন্ট্রোল হারিয়ে ধাক্কা মেরেছে।...হ্যালো, হ্যালো, শুনছেন?

—...উঁ...

—এত ভেঙে পড়বেন না মিস্টার মুখার্জি। গাড়ি চালাচ্ছিলেন দিগন্ত রায়। সাপোজড টু বি ইয়োর রিলেটিভ। স্পট ডেড। কিন্তু আপনার স্ত্রী আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে গেছেন। দু-একটা মাইনর ইনজুরি ছাড়া বিশেষ কিছু হয়নি। শকে কিছুক্ষণ আনকনসাস ছিলেন, এই পর্যন্ত। শি ওয়জ অ্যাডমিটেড টু উলুবেড়িয়া হসপিটাল। এখনও ওখানেই।...জ্ঞান ফেরা থেকে আপনার কথা বলছেন।...চলে আসুন মিস্টার মুখার্জি। আপনি লাকি ম্যান।...

ফোন ছেড়ে দিয়েছে। চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে আছে অসীম। দিগন্ত...দিগন্ত রায়! কে? লোকটার ওরিজিন্যাল নাম? প্রতিভা বেঁচে গেল!...তারপর?...

যেতে-যেতে

জানলাটা একটু তুলে দেবেন?'

'উঁ?'

'বলছি, জানলার কাচটা একটু উঠিয়ে দেবেন?'

'উঠিয়ে দেব? কেন? বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। জলের ছাঁটে সব ভিজে যাবে।'

'কোথায় বৃষ্টি দেখছেন বলুন তো? ক-খন ধরে গেছে। যেটুকু ঝিরিঝিরি হচ্ছে, তাতে তেমন একটা অসুবিধে হবে না।'

'আপনার হয়তো হবে না। আমার হবে। বৃষ্টির জল লাগলে আমার সর্দিকাশি হয়।'

'এ তো ভারি মুশকিল হল। বাইরে মেঘলা সকাল, হাওয়া দিচ্ছে, আর কামরার ভেতরটা গরমে গুমসে আছে। প্লিজ, একবার খুলে দিয়ে দেখুন না।'

'কোথায় গরম? পাখা চলছে বনবন করে। এত গরমের বাতিক যখন, এসি কামরায় গেলেই পারতেন।'

'সে তো পারতাম। কিন্তু কী করব, এইসব লোকাল ট্রেনে যে এসি থাকে না।...দয়া করে একবার খুলে দিয়ে দেখবেন কি?'

'ও:! আপনি দেখছি বেশ একরোখা লোক।'

'আমি একরোখা লোক? হা:! ভালো বলেছেন। আপনাকে জানলা খুলতে সামান্য একটা রিকোয়েস্ট করলাম, সেটা এখনও রাখেননি! উলটে ভালোমন্দ শুনিয়ে যাচ্ছেন।'

'বেশ। তুলে দিচ্ছি। তবে একটা কথা স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, বৃষ্টির ছাঁট যদি আমায় একটুও ভেজায়, তবে কিন্তু আরও ভালোমন্দ কথা শুনতে হবে।'

'ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন। ওরে ব্বাপস! কী সাংঘাতিক মহিলা! আমি পাশের কামরায় চলে যাচ্ছি।'

'না। আপনার কথায় জানলা তুলে দিলাম! এখন গিয়ে কোনও উপকারে আসবেন না। দয়া করে এখানেই বসুন।'

'বসলাম। আ: কী আরাম। শরীর জুড়িয়ে গেল।...কি ম্যাডাম, বৃষ্টি আর হচ্ছে?'

'না।'

'তবে? বললাম না, কমে গেছে? শুধু শুধু এতক্ষণ ঝগড়া করলেন! কী ঠান্ডা হাওয়া! ভালো লাগছে না?

'উঁ।'

'মেঘ জমে আছে গাছপালার মাথায়। চোখের আরাম হচ্ছে না?'

'উঁ।'

'কী উঁ-উঁ করছেন? সত্যি কথা স্বীকার করতে লজ্জা হচ্ছে?'

'আচ্ছা লোক তো আপনি। আমি উঁ-উঁ করব, না তো কি গোঁ-গোঁ করব? বলছি তো, খারাপ লাগছে না। তবু পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করার চেষ্টা করছেন কেন?'

'আহা-হা, ঝগড়া নয়। আসলে আমি একটু চড়া মেজাজে কথা বলি। এটা আমার বদভ্যেস। এর জন্য অনেকে আমায় ভুল বোঝে। প্লিজ, কিছু মনে করবেন না।'

'.....'

'খুব রেগে গেছেন বুঝি?'

'.....'

'আমি সরি।'

'.....'

'প্লি-জ। কিছু বলুন।'

'উ: বাবা। বলছি তো রেগে নেই। একটুও চুপ করে থাকতে পারেন না?'

'সত্যিই পারি না। এটাও আমার খারাপ অভ্যেস। যখন যেটা মনে হয়, বলে ফেলি। যেমন—হয়তো বলা উচিত নয়, তবু বলতে ইচ্ছে করছে, এই যে হাওয়ায় আপনার চুলের কুচিগুলো উড়ছে, দু-এক ফোঁটা জল পড়ে চিকচিক করছে, দেখতে খুব ভালো লাগছে।'

'বা:!'

'বা: বললেন কেন?'

'বলছি আপনার কথা শুনে। আপনি নিশ্চয়ই লেখালেখি করেন।'

'হা: হা:! আপনার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কস্মিনকালেও করিনি। সরকারি চাকুরে। একটা কথা বলব?'

'জিগ্যেস করার প্রয়োজন কী? আপনি তো চুপ করে থাকতে পারেন না। বলে ফেলুন।'

'বলছি, ট্রেনে ওঠার পর থেকে আপনাকে খুব চেনা-চেনা লাগছে। কোথায় যেন দেখেছি আপনাকে! ঠিক লোকেট করতে পারছি না। আচ্ছা, আপনার কি আমায় দেখে...'

'বা:!'

'আবার বা:?'

'হ্যাঁ। আপনি যখন লেখালেখি করেন না, তবে আপনার অন্য রোগ আছে।'

'রোগ?'

'হ্যাঁ। রোগ। বাংলায় বলে নেও-বাতিক। কিছু পুরুষদের এই রোগ আছে। যে কোনও মেয়ে দেখলেই তাদের মনে হয় যেন কতকালের চেনা। নানা ছুতোয় যেচে আলাপ করতে চায়।

'যা বাব্বা! ছি: ছি:। আমাকে ওই লোকদের দলে ফেলে দিলেন?'

'না ফেলে উপায় কি! আপনার যেমন সোজা কথা বলতে ইচ্ছে হয়, আমারও হয়। বলে দিলাম।'

'না, বুঝেছি। আমার সত্যিই ঘাট হয়েছে। জাস্ট একটা ইনফর্মেশন দেবেন? মুকুন্দপুর স্টেশন আর কতক্ষণ লাগবে, বলতে পারেন?'

'নেক্সট স্টেশন।'

'যাক। এসে গেছি তাহলে। সরি ম্যাডাম। আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দু:খিত।'

'না-না। দু:খপ্রকাশ করার মতো কিছু ঘটেনি। চলুন, আমিও নামব।'

'আপনি! আপনিও মুকুন্দপুরে থাকেন নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আরেকটু ইনফর্মেশন দেবেন? মিত্তিরপাড়া কীভাবে যাব বলতে পারেন?'

'মিত্তিরপাড়ায় কার বাড়ি?'

'শ্যামলেন্দু মিত্রর।'

'ওই রিকশাস্ট্যান্ড থেকে একটা রিকশা নিয়ে নিন। যে কাউকে বললেই পৌঁছে দেবে।'

'থ্যাঙ্কিউ। আমি দিব্যেন্দু। হয়তো আর দেখা হবে না, তাই—।'

'দেখা হবে না? ঠিক জানেন?'

'মানে? কী করে হবে?'

'আপনার কি আজ কোনও প্রোগ্রাম আছে? ওখান থেকে কোথাও যাবেন কি?'

'ইয়ে-মানে...হ্যাঁ। আজ বিকেলে। আশ্চর্য! আপনি জানলেন কী করে?...আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'পারবেন না তো! বুঝতে হলে ঘটে কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি থাকতে হয়। উফ! মানুষ যে এত ক্যাবলাকান্ত হয়।'

'কী বলছেন বলুন তো? কী পেয়েছেন আমাকে? মুরগি? তখন থেকে যা-তা বলে যাচ্ছেন।'

'না বলে উপায় কি? অবাক হয়ে দেখছি, বড় একটা চাকরি করেন, অথচ নিজের ওপর কোনও কনফিডেন্স নেই। শুধু বড়-বড় বুলি। কোথায় দেখেছি... কোথায় দেখেছি...কিছুতেই মনে করতে পারলেন না।'

'উঁ।'

'বা:! এখন নিজেই চিঁ-চিঁ করছেন? সেই গলা কোথায় গেল? সহজ ব্যাপার মাথায় আসে না? গোবরগণেশ! আজ বিকেলে কোথায় যাবেন বন্ধুকে নিয়ে?'

'অ্যাঁ-ও-আরে! আ-আপনি...আপনি...'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমিই সুমিত্রা। আমায় ছবিতে দেখেছেন। আমিও দেখেছি। যাক, শেষপর্যন্ত লোকেট করতে পেরেছেন। কী ভাগ্য আমার! বিকেলে আমাদেরই বাড়ি আসছেন। দেখা হবে।...চলি। এই যে, আপনার রিকশা এসে গেছে। উঠে পড়ুন।'

'এক মিনিট, সুমিত্রা। এক মিনিট।'

'কী হল?'

'বিশ্বাস করুন, সবটা আমার সিনেমা মনে হচ্ছে। সেটা ধরেই নিয়েই শেষ প্রশ্নটা করব?'

'করুন।'

'পছন্দ হল?'

'প্রশ্নটা আমারই আপনাকে করা উচিত ছিল। কারণ, আমিই আপনাকে বেশি গালমন্দ করেছি।'

'যদি বলি, সেটা আমি খুব এনজয় করেছি?'

'তাহলে আমিও।'

একা-একা

হ্যালো।

—হ্যালো। দেবেশ দাস বলছেন?

—না-না, রং নাম্বার।

—ও স্যরি।...খুট।

পিঁপ...পিঁপ...পিঁপ...পিঁপ...

—হ্যালো।

—.....

—হ্যালো...হ্যালো!

—হ্যালো। এটা কি দেবেশ দাসের ফোন নাম্বার?

—মোটেই নয়। আপনি একটু আগেই করেছিলেন না?

—হ্যাঁ, স্যরি। কিছু মনে করবেন না।

—না-না। আমার মনে হচ্ছে আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে। দেবেশ দাসের নাম্বারটা আপনি ভুল নোট করেছেন। আমার নাম্বার হচ্ছে ৯৪৩৩৩০৯৩০১...হ্যালো...

খুট।...

—যা:, রেখে দিল। অদ্ভুত মহিলা তো! পরপর ভুল নাম্বার করছে, বলতে গেলাম...ধ্যুৎ!

পিঁপ...পিঁপ...পিঁপ...

—আবার ফোন। আরে! এ তো একই নাম্বার। নিশ্চয়ই সেই মহিলা। মহাজ্বালাতন হল! ভুল নাম্বার করছে, শুনছেও না।

—হ্যা-লো!

—.....

—হ্যালো। শুনুন, দয়া করে আমার নাম্বারটা একটু নোট করে নিন। এটা কোনও দেবেশ দাসের নাম্বার নয়। শুনছেন?

—.....

—আরে, কথা বলছেন না কেন? আহা, আমি বুঝতে পারছি, আপনি ইচ্ছে করে করছেন না। দেবেশ দাসকে আপনার এখনই দরকার। তাই তো?

—নাহ। কোনও দরকার নেই।

—তবে?

—আমি জানি, এটা কার নাম্বার।

—ক-কী! জানেন?

—হ্যাঁ, জানি। দেবাঞ্জন দত্তর নাম্বার।

—অ্যাঁ—! হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক। আমি দেবাঞ্জন বলছি। কিন্তু তাহলে এতবার ধরে দেবেশ—

—ইচ্ছে করল।

—ইচ্ছে করল? আমি তো আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

—বুঝবেন কী করে? গলাটাই চিনতে পারলেন না।

—.....

—কী হল? চুপ করে গেলেন যে?

—দেখুন ম্যাডাম, আমি ভীষণ ক্লান্ত। সারাদিন প্রচুর চাপে থাকি। এই রাত সাড়ে আটটার সময়—

—জানি, জানি। এই সময়টুকুই আপনি রিল্যাক্স করেন। টিভিতে খবর দেখতে-দেখতে ফ্রিজ থেকে খাবার বের করে আভেনে গরম করবেন। তারপর দুপেগ হুইস্কির সঙ্গে ডিনার শেষ করে...ঠিক বলছি তো?

—টুহান্ড্রেড পার্সেন্ট। আয়াম জাস্ট সারপ্রাইজড। আমার সম্পর্কে যাবতীয় ইনফর্মেশন আপনি রাখেন। থ্যাঙ্ক য়ু ফর দ্যাট। বাট হোয়াই? কেন? কে আপনি?

—বলব না। আপনি গলা চিনতে পারেননি। আপনাকে গেস করতে হবে।

—রাবিশ! ভাল্লাগছে না। ছেড়ে দেব কিন্তু।

—লাভ নেই। আবার করব।

—সুইচ অফ করে দেব।

—তখন ল্যান্ডলাইনে করব। সেটাও যদি অফ করে দেন, কাল সকাল থেকে ফের শুরু করব।

—উ:! প্লিজ! কেন জ্বালাতন করছেন বলুন তো? আচ্ছা জেদি মেয়ে তো আপনি!

—এই তো। ঠিক বলেছেন এতক্ষণে। তবু চিনতে পারছেন না? আপনার স্মৃতিতে এত মরচে পড়ে গেছে! আস্ত গবেট একটা।

—গবেট! হাউ ডেয়ার—...ওহ মাই গড। আপনি-আপ-তুমি-তুমি কি—

—হ্যাঁ, নবনীতা। ছি:! তুমি এই ক'বছরে এতটা ব্লান্ট হয়ে গেছ!...যাকগে, বলো কেমন আছ?

—ও:...! কেমন আছি, এ প্রশ্নের মানে কী? তুমি তো দেখলাম আমার নাড়িনক্ষত্রের খবর রাখ।...হঠাৎ এতকাল পরে—আফটার সো মেনি লং ইয়ারস...মনে পড়ল?

—মনে না পড়ে কি উপায় আছে দেবাঞ্জন? জীবন থেকে কি মুছে দেওয়া যাবে দশটা বছর? মুছে দেওয়া যাবে দেবলীনা-অরিত্রকে?

—উঁ...। তবু...তবু আজকেই?

—ওই যে দেবলীনা-অরিত্র। একজন ব্যাঙ্গালোর থেকে, অন্যজন স্টেটস থেকে যখনই ফোন করবে, এক কথা।

—কী কথা?

—তুমি জান না? বলেনি?

—বুঝলাম। তাহলে ওদের চাপেই ফোন করলে?

—নাহ। কোনওদিনই মিছে কথা বলতে পারিনি দেবাঞ্জন। আজ সন্ধে থেকে ভীষণ টানছিল। পাগল-পাগল লাগছিল। একদিকে এতবছরের সাইলেন্স, অন্যদিকে...তারপর ঠিক করতে বাধ্য হলাম, করব। আজকেই করব।

—উঁ।

—কী?

—ভাবছি।...ভাবছি, তুমি কেমন আছ?

—আমি?...জিগ্যেস করতে এতক্ষণ হেসিটেট করছিলে? আমারও তো একই রুটিন দেবাঞ্জন। সেই অফিস, বাড়ি, চান-খাওয়া-ঘুম। ২৪ ঘণ্টা ৩৬৫ দিন। শোননি ওদের কাছে?

—শুনেছি।...

মিনিটখানেকের নৈ:শব্দ্য।

—কী হল, কথা ফুরিয়ে গেল?

—নাহ। একটা অপরাধবোধ হচ্ছে, আই শুড কনফেস। ফোনটা আমারই করা উচিত ছিল। ভেবেছি। চেষ্টাও করেছি। পারিনি।

—কেন? ইগো? ভ্যানিটি?

—না। ভেবেছি কীভাবে তুমি রিঅ্যাক্ট করবে। কুঁকড়ে গেছি।

—হ্যাঁ, ভেবেছ আমি যা জেদি মেয়ে! যদি উলটোসিধে কিছু বলে দিই, তাই তো?

—ভাবাটা কি ভুল?

—বা:-বা:! এইসব ভেবে-ভেবেই তো শেষ করে দিলে। ফেরার আর জায়গা রইল না?

—বাজে কথা বোলো না নীতা। তোমার জেদ নেই? তুমি জেদি নও?

—জেনেশুনেই তো বিয়ে করেছিলে। বিয়ের আগে একবছর আমরা ঘুরেছিলাম। আমার সব শর্টকামিংস তোমার কাছে খুলে বলেছিলাম। তুমি কী বলেছিলে, ভুলে গেছ?

বলেছিলে, সব মানিয়ে নেব।

—চমৎকার! কী সুন্দর করে সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে? তুমি এখনও বদলালে না নীতা। সত্যি করে বলো, আমি দশবছর চেষ্টা করিনি? তুমি একতরফা ঝেড়ে গেছ, আমি চোখমুখ বুঁজে সহ্য করেছি। বাট—বাট য়ু ওয়্যার সো ডমিনেটিং! সো কনজারভেটিভ। ক্লাবে-পার্টিতে যেতে দেবে না, বন্ধুদের সঙ্গে ড্রিঙ্ক করতে দেবে না, শেষপর্যন্ত আমার ওই—

—বলো, বলো, থামলে কেন? শেষর্যন্ত তোমার ওই সেক্রেটারি মেয়েটাকে নিয়ে আমি অশান্তি শুরু করলাম, তাই তো? দেবাঞ্জন, আমার সব দোষ আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু একটা কথা আজ আমায় বলো তো, সত্যি-সত্যি তুমি ওর সঙ্গে ইল্লিগ্যাল রিলেশনস-এ জড়িয়ে পড়েছিলে, কি পড়োনি? জাস্ট স্পিক দ্য ট্রুথ!

—আমি কিছুই বলতে চাই না।

—কেন? আই সোয়ার, তুমি আজ যা বলবে, আমি সেটাই বিশ্বাস করব।

—কী লাভ নীতা? বিশ্বাস করা-না-করায় আমাদের কার কী আসে-যায়?

—তবু-তবু অন্তত বুকের ক্ষতগুলোয় প্রলেপ পড়বে।

—প্রলেপ পড়বে? না ব্যথা বাড়বে? তোমার মনে পড়ছে সেই রাত্রিটার কথা, যেদিন আমি বম্বে ট্যুর থেকে ফিরে এলাম? ঢুকতেই তুমি আমায় স্ট্রেট চার্জ করলে! কী ভয়ংকর তোমার সে মূর্তি! আমি বলতে চেয়েছিলাম, ওই ট্যুরে এক রাতের কথা। বেশি ড্রিঙ্ক করে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। ওই সেক্রেটারি মেয়েটাই আমায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিয়েছিল। তারপর কী ঘটেছে, আমার মনে নেই। কিছু মনে নেই। সব ব্ল্যাক আউট। তুমি বলতেই দিলে না। অসহায় ছেলেমেয়ে দুটোর সামনে অকথ্য গালাগালি...ওরা কাঁদছে... কাঁপছে...তুমি সব ভেঙেচুরে ফেলছ...মনে পড়ছে নীতা?

—স্যরি দেবাঞ্জন। তুমি তো জান, রাগলে আমার মাথার ঠিক থাকে না। কিন্তু তুমি পরে আমায় বোঝানোর চেষ্টা করলে না কেন?

—সে সুযোগ তুমি দিয়েছিলে আমায়? সেই রাত থেকেই আমাদের সব আলাদা করে দিলে তুমি। তার পরদিন থেকে আমায় দেখিয়ে-দেখিয়ে, প্রতিশোধ নিতে ওই যে তোমার কলিগ ছেলেটাকে—

—যা:! ও আমার চেয়ে বয়েসে কত ছোট।

—তাতে কী হয়েছে? আমার মেল ভ্যানিটিকে চাবুক মারতে তুমি সিগারেট ধরলে, মদ ধরলে, রাত করে বাড়ি ফিরতে শুরু করলে...! ওই ছেলেটাই তোমায় পৌঁছে দিত! আমি ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে চুপ করে বসে থাকতাম বারান্দায়।...শেষপর্যন্ত আমারও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। পারিনি। দ্যাট ওয়জ মাই ফেলিঅ্যর।

কয়েকমুহূর্তের নৈ:শব্দ্য।

—কী হল, এবার তুমি চুপ করে গেলে কেন?

—আমি—আমার কিছুই বলার নেই দেবাঞ্জন। হয়ত আমি, আমিই—

—ওকে-ওকে নীতা। এটুকুই যথেষ্ট। একটাই আফশোস, সেদিন যদি বুঝতে তবে হয়ত আমাদের মাঝের দিনগুলো অন্যরকম হত।

—আর সুযোগ নেই দেবাঞ্জন?

—.....

—কী হল? আর হয় না, না?

—চেষ্টা করতে চাও?

—তুমি কি রাজি?

—একটু সময় দাও। ভেবে দেখি।

—কাল ফোন করব?

—না। একহপ্তা পর। আমিই করব তোমায়। রাত অনেক হল। এবার ছাড়ি।

—ইচ্ছে করছে না।

—পাগলি মেয়ে! গুডনাইট।

সর্বনাশের সামনে

টানা কাচের জানলা বন্ধ ছিল। কাবেরী খুলে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে একঝলক হিমেল বাতাস শরীর কাঁপিয়ে দিল।

সামনের দিকে স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে কাবেরী। দুচোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে তৃপ্তিতে। 'অহো, কী দৃশ্য হেরিলাম, জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলিব না।' —মনে মনে বিড়বিড় করছে। এ লাইনটা দেবেন্দ্রনাথের 'হিমালয় ভ্রমণ'-এ ছিল?

সবুজ, শুধু সবুজের মেলা। সবুজ লন। তারপর ঢাল নেমে গেছে। সেখান থেকেই সবুজ-নীল পাহাড়ের ঢেউ। কাছে থেকে দূরে, আরও দূরে। রোদ-মেঘের ছায়া পড়ে রং পাল্টাচ্ছে। তারপর আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। মেঘ ঢেকে দিচ্ছে, ফাঁকে-ফাঁকে উঁকি মারছে সোনার মুকুট।

কতদিন পরে বেড়াতে আসা। কাবেরীর বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

পিছন থেকে আচমকা অরণ্য এসে জাপটে ধরেছে।

'অ্যাই!' ছিটকে ওঠে কাবেরী, 'কী হচ্ছেটা কি?'

'উমম? কী হচ্ছে?' ঘাড়ে মুখ ঘষতে-ঘষতে বিড়বিড় করে অরণ্য।

'ওঃ, ছাড়ো! এই তো এলাম। দ্যাখো, দ্যাখো, কী অপূর্ব সিনারি।'

'আমি তো তোমার সিনারি দেখব বলে এসেছি, ম্যাডাম।'

'অসভ্য! এরকম বিউটিফুল জায়গায়...তুমি কী বলো তো?'

'কিছুই নয়। একজন স্বাভাবিক মানুষ। ম্যাডাম, আমার তর সইছে না।'

'যাও, চান করে এসো। তুমি বেরোলে আমি যাব। চান করে দুজনে ঘুরতে বেরোব।'

'পাগল! হানিমুনে এসে সিনারি দেখে সময় নষ্ট করব?'

'হানিমুন? কী বলছো?'

'অবকোর্স। সেকেণ্ড হানিমুন।'

বলতে-বলতে অরণ্য সামনে বেড় দিয়ে কাবেরীর ঠোঁটে ঠোঁট গুঁজে দিয়েছে। আস্তে-আস্তে টানছে...

খুট-খুট-খুট! দরজায় নক হচ্ছে।

'যা: শ-শালা!' একঝটকায় কাবেরীকে ছেড়ে দিল অরণ্য। মুখ-টুখ মুছে দরজা খুলে দিতে এগোল। চোখমুখ কুঁচকে গেছে।

কেয়ারটেকার বাহাদুর দাঁড়িয়ে।

'বাহাদুর জিগ্যেস করছে, কী খাব।'

জানলার আলসেতে থুতনি রেখে কাবেরী বলল, 'তুমি স্নানে যাও। আমি বলে দিচ্ছি।'

কট-কট করে তাকাতে তাকাতে তোয়ালে নিয়ে অরণ্য বাথরুমে ঢুকল। দড়াম করে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ। কাবেরী ধীরেসুস্থে বাহাদুরকে লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে আবার এসে দাঁড়াল জানলায়। হিমালয় ওকে চুম্বকের মতো টানছে।...

সুবীর এখন কী করছে? নিশ্চয়ই অফিসে। বাবাই স্কুলে, ওর ছুটি তিনটেয়।

এভাবে যে চলে আসা যায় কোনদিন ভাবেনি।

কী চমৎকার প্ল্যান করেছে অরণ্য। কোথাও ফাঁক নেই।

যা ঘটছে বা ঘটতে চলেছে, তার জন্যে দায়ী সুবীর। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ দায়ী। কাবেরী জীবনে এসব ভাবেনি।

অরণ্য সুবীরের কলিগ। একই কাগজে সুবীর আর্ট ডিরেক্টর, অরণ্য রিপোর্টার। বয়েসে বেশ ছোট। অরণ্য সুবীরের ছবির ভক্ত।

সুবীর অরণ্যকে ওদের বাড়ি নিয়ে এল। প্রথম দেখাতেই কাবেরীর ছেলেটাকে ভালো লেগে গেল। স্মার্ট, হ্যান্ডস্যাম।

অরণ্য প্রথমেই ধাক্কা দিল। কাবেরীর দিকে তাকিয়ে দুষ্টু হেসে বলেছে, 'সুবীরদা, আপনি কী করে মেয়েদের এত সুন্দর পোট্রেট আঁকেন, এতদিনে বুঝলাম।'

সুবীর হেসেছে।

তারপর দিন-দিন অরণ্যর এ বাড়ি আসা বেড়েছে। প্রায়ই ওরা তিনজন রাতে গ্লাস নিয়ে বসেছে। সেসব রাতে অরণ্য বাড়ি ফেরেনি। ফোনে জানিয়ে দিয়েছে।

কোনও রাতে অরণ্য হুইস্কিজড়িত স্বরে বলেছে, 'আচ্ছা সুবীরদা, একটা কথা বলো তো! এক বউ বা বরকে নিয়ে সারাটা জীবন টেনে যাওয়া, এর কোনও মানে আছে?'

'নাহ!' সুবীর জড়িত গলায় বলেছে, 'কোনও মানে নেই। তবু থাকতে হয়। এটাই নিয়ম। সংসার টিকিয়ে রাখতে হয়। অরণ্য, তুমি এখনও বিয়ে করোনি। এসব নিয়ে এখন মাথা ঘামিও না। বিপদ, বুঝলে খুব বিপদ!'

'কীসের বিপদ? বিয়ে করে ফেললে অন্য পুরুষ বা মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যাবে না, কোথায় লেখা আছে? অল বোগাস ট্রাডিশন! উই আর অল পলিগ্যামাস, বাই ইনস্টিংকট।'

'পাচ্ছ কোথায়? পেলে সম্পর্ক করো না, কে বাধা দিচ্ছে? বাপু হে, আমাদের সোসাইটিতে এসব অত ইজি নয়।'

'পাওয়ার কথা ছাড়ো!' অরণ্য চোখের কোণ দিয়ে কাবেরীকে দেখে নিয়ে বলেছে, 'যদি পাওয়া যায়, তোমার মেনে নিতে আপত্তি নেই তো?'

সুবীরের নেশা হলেও তালে ঠিক। দেখে ফেলেছে অরণ্যর তাকানো। খলখল হেসে বলেছে, 'আপত্তি কিসের? নো প্রবলেম! ধরো, তোমার বৌদির যদি তোমায় মনে ধরে, তুমি যদি চাও, তাতে আমি না বলার কে? মিয়াবিবি রাজি, তো কেয়া করেগা কাজি! আমি এসব ব্যাপারে লিবারাল।'

'কী বলছো আবোলতাবোল?' কাবেরীরও অল্প নেশা ধরে এসেছে। ঝংকার দিয়ে উঠল, 'মাতাল হয়ে গেছ একেবারে। নাও, ওঠো! শুয়ে পড়।'

বলতে গেলে, সেই সূচনা। ধিকিধিকি আগুন খুঁচিয়ে দেওয়া। কাবেরীর চেয়ে সুবীর প্রায় দশবছরের বড়। তার ওপর ছবি-ছবি করে ওর শরীরের খিদে কবেই মরে গেছে।

শেষ কবে ওকে আদর করেছে, কাবেরীর মনে পড়ে না।

অথচ, সাঁইতিরিশে দাঁড়িয়ে কাবেরী এখনও টানটান। খাঁজখোঁজ যথেষ্ট আকর্ষণীয়। কতদিন এমন হয়েছে, নার্সিসাস-এর মতো নিরাবরণ হয়ে আয়নার সামনে নিজেকেই মেপেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে।

অরণ্য হানা দেওয়া বাড়িয়ে দিল।

তখনও সুবীর ফেরেনি। ফেরার কথাও নয়। মর্নিং ডিউটি করে ভরদুপুরে অরণ্য এসে হাজির। বাড়ি ফাঁকা।

'চা খাওয়াও ম্যাডাম। তোমার হাতের চায়ের টেস্টই আলাদা।'

'চা খাবে কী? এখন তো লাঞ্চ টাইম।'

'এভরিটাইম ইজ টি টাইম। না খাওয়ালে চললুম।'

চা এনে টেবিলে রাখছে, আচমকা কোমর জড়িয়ে ধরল।

'অ্যাই, অ্যাই, কী হচ্ছেটা? চা পড়ে যাবে।'

'কিচ্ছু পড়বে না। তোমায় একটা চুমু খাব।'

'না—না। খবর্দার অরণ্য!'

'কী না-না? সুধীরদা গ্রিন সিগন্যাল দিয়েছে, বেশি ভ্যানতারা করো না তো।'

'সুবীরদা বললেই হল? আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছে নেই?'

'তোমার ইচ্ছে তো আছেই। অরণ্য চোখ চিনতে ভুল করে না।'

বলতে-বলতে জোর করে ঠোঁটের মধ্যে ঠোঁট ডুবিয়ে দিল। কাবেরীর তখন কী অবস্থা, ও যদি জানত! ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি ঠেলে বেরোচ্ছে।...

'এই যে ম্যাডাম! রবীন্দ্রনাথ হয়ে গেলে যে! যাও, গিজারে জল গরম আছে।'

অরণ্য মাথা মুছতে-মুছতে বেরিয়ে এসেছে। কাবেরীর ঘোর কেটে গেল। উষ্ণ জল গায়ে ঢালতেই কী আরাম। সব শ্রান্তি উবে গেছে। বাথরুমের দরজায় হঠাৎ ঠকঠক।

'কে?'

'আমি। আমি ছাড়া আছে কে?'

'কী হয়েছে?'

'কিছুই হয়নি। একবার খোলো না! তোমায় দেখব।'

'মানে?'

'মানে আবার কী! তোমায় বার্থ-ডে সুটে দেখব। একবার খোলো।'

'মারব এক থাপ্পড়।'

'সে মারো। যত খুশি মারো। তবু খোলো।'

'পাজি কোথাকার!'

বলল বটে, কিন্তু শরীরে কাঁপুনি ছিল।...বিয়ের পর প্রথম-প্রথম এমন হতো। তাড়াতাড়ি শালোয়ার-কামিজ পরে বেরিয়ে এল কাবেরী।

'চলো, বেরোও।' টিপ পড়তে-পড়তে কাবেরী বলল।

'কোথায়?'

'তুমি অদ্ভুত লোক তো! তোমার সুবীরদাকে পৌঁছ সংবাদ দিতে হবে না?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। বলবে, অরণ্য আমায় খুব 'ইয়ে' করছে।'

হাতের চিরুনি দিয়ে এক ঘা দিল কাবেরী। অরণ্য ওকে জড়িয়ে ধরে বলল,—'সব তুলে রাখছি। আজই মিটিয়ে দেব।'

দুজনে পাশাপাশি হাঁটছে। বাতাস ভরতি অক্সিজেন। কোনও ক্লান্তি আসে না। পাহাড়ি উতরাই পথ, একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে খাদ। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে কাঠের বাড়ি। অনেক নিচে শহর।

কালিম্পং-এর এই তাশিডিং টুরিস্ট লজ মূল শহর থেকে অনেকটা ওপরে। প্রায় শেষ বিন্দুতে। এরপরেই আর্মি ক্যাম্প শুরু। খুবই নির্জন, নিরালা। ওদের পক্ষে আদর্শ। সমস্যা একটাই, মোবাইলে টাওয়ার আসে না। একটা ফোন করতে হলেও বেশ খানিকটা নেমে আসতে হয়।

সুতো ছেড়ে দিয়েছিল সুধীরই। প্রথম-প্রথম অরণ্য বাড়িতে এলে ও সুবীরকে জানিয়ে দিত। সুবীর হাসত। বলত, 'আসুক না! তোমার খারাপ লাগে না তো? একা-একা থাক, সঙ্গ দিয়ে যায়।'

সঙ্গ! এসব জেগে ঘুমোনো ছাড়া কী! নিজের চাহিদা নেই, বউকে আগুনের দিকে ঠেলে দাও।

অরণ্য একদিন সকাল দশটায় এসে হাজির। কাবেরী তখনও রাতপোশাকে। সুবীর ছেলেকে নিয়ে সবে বেরিয়েছে।

দরজা খুলে ও অবাক, 'তুমি! সাত সকালে?'

'নাইট ডিউটি ছিল। চলে এলুম। তুমি বড্ড টানছিলে।'

'পাগল! চানটান করোনি, চলে এলে?

অরণ্য অদ্ভুত হেসে চলেছে, 'আজ আমরা দুজনে একসঙ্গে চান করব যে! ঠিক রাধাকৃষ্ণের মতো। তোমায় আমি সাবান মাখিয়ে দেব, তারপর জল ঢালব আস্তে-আস্তে।'

উ:! সেইমুহূর্তে ছিটকে সরে গেছিল কাবেরী। ছেলেটা সাংঘাতিক কথা জানে। কাজের মেয়ে মানদা এসে না পড়লে সেদিনই হয়তো সবকিছু হয়ে যেত।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা বাজারের কাছে এসে পড়েছে। দোকানপাট, রেস্তোরা। ছোট-ছোট হলুদ বোর্ড ঝোলানো, ফোন বুথ।

একটা খুপরিতে ঢুকে পড়ল কাবেরী। ফোনের বোতাম টিপল।

'হ্যালো।'

'হ্যালো, মা?'

'হ্যাঁ বাবাই সোনা! স্কুলে যাওনি?'

'আজ তো স্যাটারডে। ছুটি। দিদার কাছে গিয়ে সব ভুলে গেছ?'

'ও হো। তাই তো! তোমরা সব ভালো আছ সোনা? বাবা?'

'হ্যাঁ মা। ফাইন। তোমার জন্যে একটু-একটু মন খারাপ করছে। দিদা কেমন আছে?'

'এখন ভালো। মন খারাপ কোরো না বাবু, লক্ষী হয়ে থাকো। দু তিনদিন পরেই ফিরে যাচ্ছি। বাবাকে বোলো।'

'হ্যাঁ মা। তুমি আবার ফোন করবে তো?'

'কাল সকালেই করব। রোজ করব। ...ছাড়ি?'

'হ্যাঁ, বাই।'

'বাই।'

ফোন রেখে অব্দি হৃদপিণ্ড লাফাচ্ছে। বাবাইসোনার মায়ের জন্যে মন-কেমন করছে? ও যদি জানত, মা সত্যি এখন কোথায়!

'কী গো ম্যাডাম, মুখ হঠাৎ বাংলার পাঁচ হয়ে গেল কেন?'

কাবেরী অরণ্যর মুখের দিকে তাকাল। আস্তে-আস্তে বলল, 'বাবাই ফোন ধরেছিল। ওর মন-খারাপ করছে।...চলো অরণ্য, ফিরে যাই।'

অরণ্য একমুহূর্ত পলকহীন চোখে চেয়ে রইল। তারপর হো-হো করে হেসে উঠল!

'তুমি পারোও বটে! ছেলের বয়েস পনেরো হয়ে গেল, এখনও এত পুতুপুতু! জান, বিদেশে এই বয়েসের ছেলে গার্ল ফ্রেন্ডের সঙ্গে ডেটিং করে। থার্ডক্লাস ইন্ডিয়ান সেন্টিমেন্ট! ফরগেট, ফরগেট অল। এখানে শুধু তুমি আর আমি। কলকাতায় ফেরার পর তোমার সংসার। আন্ডারস্ট্যান্ড?...চলো, অনেক বেলা হয়েছে।'

কাবেরী ঘোরের মধ্যে ঘাড় নাড়ল।

শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পং পর্যন্ত আসা, ট্যুরিস্ট লজ বুকিং সব ব্যবস্থাই অরণ্য করেছে। নিখুঁত অ্যারেঞ্জমেন্ট।

কাবেরীর বাপের বাড়ি জলপাইগুড়ি শহরে। বহুদিন আসা হয়ে ওঠেনি। ফোনেই যোগাযোগ। পনেরো দিন আগে বাবা জানালেন, মায়ের শরীর ভালো নেই। মাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল। এদিকে ছেলের ফার্স্ট টার্ম পরীক্ষা সামনে, সুবীরের পুজোসংখ্যার চাপ, সবাই মিলে বেরোবার উপায় নেই। অরণ্য শুনেই লাফিয়ে উঠেছে।

'অ্যায়সা মওকা অওর কাঁহা মিলেগা...'

কাবেরী বড়-বড় চোখে চেয়ে ছিল।

'বুঝলে না? সত্যি, মেয়েদের ঘটে বুদ্ধি এত কম! থোড়া সা দিমাক লাগাও ম্যাডাম।'

কাবেরী তবুও হাঁ।

'শোন, ভালো করে শোন। তুমি সুবীরদাকে বলবে ট্রেনের টিকিট কেটে দিতে। মাসিমাকে দেখতে যাবে। আমিও একই দিনের একই ট্রেনে টিকিট কাটছি। অফিস থেকে নর্থ বেঙ্গলের একটা অ্যাসাইনমেন্ট ম্যানেজ করছি। দুজনে টুক করে নেমে যাব এন জে পি। ওখান থেকে বাই কার স্ট্রেট কালিম্পং। দুরাত ওখানে মজা করে তুমি চলে যাবে মার কাছে, আমি অফিসের কাজে। নো রিস্ক। অ্যাগ্রিড?'

কাবেরীর বুকের মধ্যে হঠাৎ ঢাকের বাজনা বেজে উঠেছিল। মুক্তি! কতকাল পরে মুক্তির স্বাদ।

তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত সব ঠিকঠাক চলেছে। সুবীর এসেছিল স্ত্রীকে ট্রেনে তুলে দিতে। তিস্তাতোর্ষা হুইশল না দেওয়া পর্যন্ত অরণ্যর টিকি দেখা যায়নি। কাবেরীর বুক কাঁপছিল। ডানকুনি পেরোতেই মক্কেল হাজির। একই কোচে টিকিট। একটু দূরের বার্থ।

বাইরের লনে বাহাদুর দাঁড়িয়ে আছে। একগাল হেসে বলল, 'মেমসাব, খানা রেডি। লাগা দে?'

'হ্যাঁ।'

বিয়ের ঠিক পরে ওরা বেড়াতে গেছিল ভূটানে। সতেরো বছর হয়ে গেল।

কাবেরীর স্পষ্ট মনে আছে, ভালোভাবে জানাজানি হতে-হতে কেটে গেল প্রায় তিন-চারদিন। তারপরেও লজ্জা-সংকোচ! কাবেরী তখন মোটে কুড়ি। তার সঙ্গে সুবীরের ছবির নেশা। পাহাড়-অরণ্য নিসর্গ দেখে খেপে গেল। কাবেরীও ভীষণ ভালোবাসে প্রকৃতি, তবে ওর মতো নয়। হানিমুনেও শান্তিনিকেতনি ঝোলা কাঁধে। যেখানে-সেখানে বসে পড়ছে। স্কেচবুক-পেন্সিল নিয়ে আঁকছে। সঙ্গে যে ফুটন্ত এক তরুণী আছে, হুঁশ নেই। কাবেরীর মাঝে-মাঝে বিরক্ত লেগেছে। প্রায় অপরিচিত স্বামী, মুখ ফুটে বলতে পারেনি।

সেদিক দিয়ে পাল্লায় মাপলে এবারের 'সেকেন্ড হানিমুন' কয়েকশো মাইল এগিয়ে। কোনও তুলনাই হয়না। কাল সন্ধে পর্যন্ত একটু বাধো-বাধো ছিল। রাত নামলে সব বন্ধনমুক্ত। লজ্জাহীন। এখনও, এই প্রান্ত-যৌবনেও শরীর-মনে যে এত ইচ্ছে লুকিয়েছিল, বুঝতে পারেনি। একধাক্কায় বয়েস কমে গেছে দশবছর।

দুপুরে একশিফট আনন্দের পর ফুরফুরে মেজাজে ঘুম থেকে উঠেছে দুজনে। বাইরের লনে বিকেলের চা খাচ্ছে।

হঠাৎ কাবেরীর মনে পড়ে গেল।

'শোন, একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে।'

'কী?'

'আজ ফোন করা হয়নি। রবিবার। তোমার সুবীরদা বাড়ি থাকবে। বাবাই ফোন না পেয়ে যদি জলপাইগুড়ি ফোন করে?'

'ও: ম্যাডাম! ফরগেট অল। তোমায় মানুষ করা গেল না। সর্বক্ষণ ভয়েই মরছ। ওরা ফোন করতে যাবে কেন? তুমি তো কাল বলেই দিলে, তুমি করবে।'

'হ্যাঁ-না-মানে...করিনি তো।'

'করোনি আবার কি? আজ দিন চলে গেছে নাকি? এখন করবে। বি হ্যাপি, নো অ্যাংজাইটি। আই অ্যাসিওর য়ু, এভরিথিং ইস অলরাইট।... চলো।...'

কাবেরী পুটপুট বোতাম টিপল। বাজছে। বুকের মধ্যে ধকধক। কে ধরবে? সুবীর? ওর গলা কাঁপবে না তো?

ফোন বেজে যাচ্ছে। কেউ ধরছে না তো! বাড়ি নেই? কোথায় গেল? হ্যাঁ, ধরেছে।

'হ্যালো।'

'কেঅ্যা বলছ গ?'

'আমি কাবেরী। তুমি কে?'

'ব-বউদি। আমি মানদা। তুমি কোথায় গ বউদি?'

কী হয়েছে? এসব জিগ্যেস করছে কেন? মানদার তো এখন বাড়িতে থাকার কথা নয়। ঠিকে লোক, বিকেলে আসে না।

তবু কাবেরী গলায় সব কর্তৃত্ব জড়ো করে বলল, 'কে-কেন? আমি তো এখানেই। তুমি একা বাড়িতে কেন?'

'আমি তো পাহারা দিইছি গ বউদি। তুমি কোথায় গ? দাদাবাবু তো তখুন-তখনুই ফুন করল তোমার বাপের বাসায়। সিখানে ত তুমি যাও নাই গ।'

'বাজে বোকো না! কী হয়েছে বলবে তো?'

'বউদি, খোকার পা ভেইঙে গেছে গ। বাথরুমে নাইতে গিছল। সাবানে হইড়কে পাইখানার প্যানে পা ঢুইকে গিছল। সে কী যন্তরনা ছিলেটার! খালি মা-মা করে চেল্লাছে, কাঁদছে...দাদাবাবু তো পাগল-পাগল অবস্থা। তারপর গাড়ি নিয়ে ছুইটেছে নার্সিংহোমে...'

ভেঙে পড়ছে কাবেরী...তাসের ঘরের মতো সব ভেঙে যাচ্ছে...।

'ও-ওরা এখন কোথায় মানদা?'

'নার্সিংহোমেই আছে। দাদাবাবুর ছুটো ফোনে কথা করলি সব জানতি পারবে। রান্না পইড়ে আছে...আমি—'

দড়াম করে ফোন নামিয়ে রেখেছে কাবেরী। আর শোনার, সহ্য করার ক্ষমতা নেই। অরণ্য কিছু বলতে গেছিল, কাবেরীর চোখমুখ দেখে চুপ করে গেছে। দুচোখ দিয়ে ফিনকি দিয়ে জল গড়াচ্ছে, শরীর বেতসপাতার মতো কাঁপছে।

অতটা চড়াই পথ কিভাবে টানতে-টানতে নিজেকে নিয়ে এসেছে, জানে না। বাংলোর লনে পৌঁছে শরীর ছেড়ে দিল।

শরীরের সব জল কি আজ চোখ দিয়েই বেরিয়ে যাবে? বাবাইসোনা, ওর বাবাইসোনা!

পাশ থেকে অরণ্য কিছু বলতে যাচ্ছিল। অস্বাভাবিক জোরে চেঁচিয়ে উঠেছে কাবেরী, 'চুপ করো! আর একটাও কথা বললে—'

ওর চোখ জ্বলে উঠেছে বাঘিনীর মতো। সীমাহীন ঘৃণা শরীরে মোচড় দিচ্ছে।

সন্ধে নামছে। আলোর ফুলকি জ্বলে উঠছে কালিম্পং শহরে।

কাবেরী উঠে দাঁড়িয়েছে। হনহন করে ঢুকে গেল বাংলোয়। পিছন-পিছন অরণ্য। অস্বাভাবিক দ্রুততায় ব্যাগে কাপড় গোছাচ্ছে।

'এখনই আমি শিলিগুড়ি ফিরব। ব্যবস্থা করো।'

'এত রাতে! সন্ধের পর পাহাড়ে—'

'কোনও কথা শুনতে চাই না। কাল সকালের মধ্যে আমায় কলকাতা ফিরতে হবে। সে যেভাবেই হোক।'

অরণ্য চোরের মতো দৌড়ে নিচে নেমে গেল।

পরশমণির খেলা

মাঝে-মাঝে ঢুলুনি আসছে। এয়ারহোস্টেসের মৃদু ডাকে কেটে যাচ্ছে তন্দ্রা। পানীয়, খাবার দিয়ে যাচ্ছে। সিটের সামনের ছোট স্ক্রিনে সিনেমা চলছে।

দিল্লি থেকে নিউ ইয়র্ক। পনেরো ঘণ্টার নন-স্টপ ফ্লাইট। ঠায় হেলান দিয়ে সিটে পড়ে থাকা। এত একঘেয়ে, ক্লান্তিকর! আট ঘণ্টা কাটানো গেছে। সামনে সাত ঘণ্টা।

অনীশা চ্যানেল-চেঞ্জার কিটের বোতাম টিপল। সিনেমা বন্ধ হয়ে ভেসে উঠেছে ফ্লাইট-রুটম্যাপ। এয়ারবাস জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট পেরোচ্ছে। সামনে গ্রেট ব্রিটেন। তারপর পাড়ি দেবে অতলান্তিক মহাসাগর।

হাত-পায়ে খিল ধরে গেছে। স্নিকার ঢোকাতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। এতক্ষণ বসে থাকায় পায়ে সোয়েলিং হয়েছে।

ব্ল্যাঙ্কেট সরিয়ে অনীশা উঠে দাঁড়াল। টয়লেটে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিতে হবে।

জীবনে এই প্রথম এত লম্বা বিমানযাত্রা। এর আগে একবারই মোটে ওরা সবাই মিলে প্লেনে চেপেছিল। আসাম ট্যুরের সময়ে। কলকাতা থেকে গুয়াহাটি।

'যাব কি যাব না' এই নিয়ে যথেষ্ট দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ছেড়ে, প্রিয় কলকাতা ছেড়ে এত দূরে পৃথিবীর অন্য গোলার্ধে গিয়ে নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে হবে। পারবে?

বাবাকে দেখে অবাক হয়ে গেছিল অনীশা। মেয়েকে ছেড়ে যিনি কোথাও থাকতে পারে না, সেই তিনিই ওর দোলাচল দেখে বেশ ঝাঁজালো গলায় বলেছেন, 'তাহলে জি.আর.ই, টোয়ফেলের জন্যে এত খাটলে কেন? নিউ জার্সি সিটি য়ুনিভার্সিটি থেকে এমন লুক্রেটিভ স্কলারশিপ পাঠিয়েছে, তুমি যাবে না? তোমার লজ্জা করছে না?'

অনীশা তবুও কুঁইকুঁই করেছে, 'না...পেয়েছি...সেটা ঠিক আছে।...এখানেও তো পেয়েছি বাবা। এখানকার পি.এইচ.ডি. কি ফ্যালনা?'

'বাজে বোকো না! ওদেশে জেনেটিক এঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে কাজ করার যা স্কোপ আছে, এখানে আছে? তাছাড়া নিউ ইয়র্কে পার্থ আছে। নিউ জার্সি হার্ডলি ওয়ান আওয়ার ড্রাইভ।'

পার্থ! সঙ্গে-সঙ্গে এক সুদর্শন যুবকের ছবি ভেসে উঠল। অনীশার মুখে একটা লাল আভা ফুটল। বড়মাসির ননদের ছেলে। নিউ ইয়র্কের একটা নামি হাসপাতালে অ্যাটাচড। এম.ডি করে বছর তিনেক আগে ওদেশে গেছে। এখনও ব্যাচেলর। অন্তত: এদেশে সবাই তাই জানে।

গত মাসেই মাসতুতো বোনের বিয়েতে প্রথম দেখা। অনীশা স্কলারশিপ পেয়ে যাবে শুনে খুব উৎসাহ দেখিয়েছিল। বাবা তখনই ওকে বলে দিয়েছেন, 'শোনো, আমার মেয়ে খুব ইন্ট্রোভার্ট, শাই প্রকৃতির। যেতে চাইছিল না। তুমি কিন্তু ওর লোকাল গার্জেন।'

পার্থ সঙ্গে-সঙ্গে রাজি। এরপরে যে কদিন এদেশে ছিল, বাবা-মা তাকে বাড়িতে বেশ কয়েকবার ডেকে এনেছেন। একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া হয়েছে। পার্থ মোটামুটি ওদেশ সম্পর্কে একটা ছবি এঁকে দিয়েছে অনীশাকে।

অনীশা বেশ বুঝতে পারছিল, ওদের দুজনের মধ্যে একটা নতুন কেমিস্ট্রি গড়ে উঠছে।

সেটা আরও স্পষ্ট হল, ফিরে যাওয়ার দুদিন আগে। পার্থ ওকে নিয়ে পার্ক স্ট্রিটে খেতে গেল। ডিনার টেবিলে স্পষ্ট বলল, 'আমি জানি না, তুমি এনগেজড কিনা। আমি সিঙ্গল।'

অনীশা চুপ করে ছিল।

'ওকে, ওকে। তুমি ভাবো। আমার দিক থেকে, আমি ইন্টারেস্টেড।'

এর চেয়ে খোলাখুলি আর কী বলা যায়! অনীশার মনে হয়েছে, ওঁর বাবা-মাও ইন্টারেস্টেড।

তারপর নেটে, ফেসবুকে প্রায় রোজ চ্যাটিং হয়েছে। স্কাইপেও কথা হয়েছে।

অনীশা বেশ বুঝতে পেরেছে, ও সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে। জে.এফ.কে এয়ারপোর্টে পার্থ আসবে ওকে রিসিভ করতে। অনীশাকে নিয়ে নিজে ড্রাইভ করে পৌঁছে দেবে য়ুনিভার্সিটিতে।

অনীশা খুবই নিশ্চিন্ত।

প্লেনে কয়েকচক্কর হাঁটাহাঁটি করে সিটে এসে বসল। চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে এখন অনেকটা ভালো লাগছে।

ট্রলি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে এয়ার হোস্টেস এবং ক্রুরা। ব্রেকফাস্ট আসছে।

বিশাল দানব-পাখি এই এয়ারবাস। একেকটা রো-তে দশ জন প্যাসেঞ্জার। মোটামুটি প্রায় সব ভর্তি। ভারতবর্ষের নানাপ্রান্ত থেকে শুধু নয়, ঢাকা থেকেও এসে সব জড়ো হয় দিল্লিতে। দিল্লি থেকে সবাইকে পেটের মধ্যে পুরে শুরু হয় বিদেশ যাত্রা।

অনীশা চ্যানেল-চেঞ্জার দিয়ে সিনেমার অপশনে ফিরে গেল। রিজিওন্যাল সিনেমার মধ্যে বাংলা সিনেমাও আছে। বা:! সত্যজিতের সিনেমা 'চারুলতা' আছে। রবীন্দ্রনাথের লেখা। বহুদিন আগে একবার দেখেছিল টিভিতে। সুযোগ পাওয়া গেছে, আবার দেখা যাক। এসব ছবি পুরোনা হয় না।

'ম্যাম, ভেজ অর ননভেজ?' এয়ারহোস্টেস এসে দাঁড়িয়েছে।

'ননভেজ।'

যন্ত্রের মতো ট্রলি থেকে সুদৃশ্য ট্রেতে খাবার নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছে পরপর। অনীশা হেডফোন খুলে রাখল। খাওয়া শেষ করে ধীরে সুস্থে চারুলতা দেখতে হবে।

ট্রলি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। যেতে-যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘুরে চলে এল অনীশার কাছে।

'ম্যাম, সরি। দিস ইজ ফর য়ু।'

'আমার জন্যে! কে দিল?'

'আপনার পরিচিত কেউ। এই প্লেনেই আছেন।'

এয়ারহোস্টেস এগিয়ে গেল।

পরিচিত! আশ্চর্য! একটা চিরকুট। ভাঁজ করা।

অনীশা খুলল। সঙ্গে-সঙ্গে শরীরে তীব্র কাঁপুনি।

'আমিও তোমার সঙ্গে নিউ ইয়র্ক যাচ্ছি। তোমার কুড়িটা রো পিছনে আছি। ওয়াট আ-সারপ্রাইজ!—জুয়েল।'

জুয়েল! জুয়েল নামে একজনকেই চিনত অনীশা। জুয়েল মল্লিক। কিন্তু সেসব তো কবেই চুকেবুকে গেছে। জুয়েল ফিরে গেছে বাংলাদেশে।

তাইতো! ভুলেই গেছিল, এই প্লেনে ঢাকার প্যাসেঞ্জারও রয়েছে।

জুয়েল নিউ ইয়র্ক যাচ্ছে! কেন? প্রায় পাঁচ বছর পরে সেই পরিচিত হাতের লেখা। গোটা, গোটা, রাবীন্দ্রিক স্টাইল।

কী করবে অনীশা? তার মানে জুয়েল ওর সঙ্গেই নিউ ইয়র্কে নামবে। সেখানে পার্থ থাকবে। তারপর কী হবে?

অতি উপাদেয় ব্রেকফাস্ট বিস্বাদ লাগছে অনীশার। কুলকুল করে ঘাম দিচ্ছে শরীরে।

কোনও উপায় নেই। থাকলে অনীশা এখনই ফিরে যেত কলকাতায়।

জুয়েলের সঙ্গে কি ওর সত্যি-সত্যি অ্যাফেয়ার হয়েছিল? নাকি ইনফ্যাচুয়েশন? না। নয়। প্রায় তিন মাস অনীশা রাতে ওষুধ ছাড়া ঘুমোতে পারেনি।

জুয়েল ওর জীবনে এসেছিল ঝড়ের মতো। তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেছিল। ভিক্টোরিয়ার পাশের বাগানে, বাবুঘাটে গঙ্গার তীরে কত যে বিকেল, সন্ধে। কত রবীন্দ্রসঙ্গীত। কী ভালো গাইত জুয়েল।

বি.এস.সি.-তে প্রাইভেট পড়ত প্রফেসর অজিত সরকারের কাছে। ওরা তিন বন্ধু। স্যর প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিস করার জন্যে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজে।

জুয়েল ছিল স্যরের সবচেয়ে প্রিয় রিসার্চ স্কলার। ফেলোশিপ নিয়ে এদেশে গবেষণা করতে এসেছিল। স্যর ওকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনটি ছাত্রীকে গাইড করতে।

প্রথম দিনই অনীশা দেখেছিল, জুয়েলের চোখে অন্যরকম দৃষ্টি। ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলে দিয়েছিল, ছেলেটা ওর টানে পড়ে গেছে। একইসঙ্গে অনীশাও আকর্ষণ বোধ করছে। চুম্বকের টান।

তারপর যা ভেবেছিল, তাই হল। জুয়েল ওর জন্যে রোজ কলেজের বাস স্টপে অপেক্ষা করত। সায়েন্স কলেজে যেদিন ওরা প্র্যাকটিকাল করতে যেত, জুয়েল ওর সঙ্গে

উজিয়ে আসত বাড়ি পর্যন্ত।

জুয়েল যে মুসলমান, অনীশা জেনেছে অনেক পরে। নাম শুনে বোঝার উপায় নেই। সেই রাতে ঘুমোতে পারে নি। বাবা-মা কি এ সম্পর্ক মেনে নেবে? হিন্দু ব্রাহ্মণ ফ্যামিলি। যতই প্রগেসিভ হোক, অন্য ধর্মে মেয়েকে বিয়ে দেওয়া হজম করতে পারবে কি? অনীশা বাবা-মাকে অসম্ভব ভালোবাসে, তাদের কষ্ট দিয়ে কিছু করতে পারবে না।

ততদিনে ঘনিষ্ঠতা গাঢ় হয়েছে। আর কিছু না হোক, হাত ধরা, হালকা আলিঙ্গন, ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়ানো পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। ছেলেটার এমন চার্মিং ইন্টেলিজেন্ট পার্সোনালিটি, ও কাছে এলেই শরীরে-মনে তীব্র সুরে সরোদ বাজতে শুরু করে।

নিদ্রাহীন রাত কাটাবার পর কলেজের গেটে জুয়েলকে দেখে অনীশা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, এবারে সরাসরি কথাটা বলতে হবে। আর দেরি করা যাবে না!

'জুয়েল, নাও উই শুডনট প্রসিড ফারদার। লেট আস পার্ট অ্যাজ ফ্রেন্ড।'

'মানে? কী বলছ? কেন?'

'দ্যাখো, আমরা অনেকটা এগিয়ে গেছি। অথচ এই রিলেশনের কোনও পরিণতি নেই। তোমার ব্রাইট ফিউচার। পেপার সাবমিট করে তুমি চলে যাবে ঢাকায়। তোমায় যেতেই হবে।'

'যেতে হলে তোমায় নিয়েই যাব। অথবা থাকব।'

'বি প্র্যাকটিকাল জুয়েল। হাও ইজ ইট পসিবল?'

'হোয়াই নট? তুমি গ্র্যাজুয়েশন, এম.এসসি করা পর্যন্ত আমি প্রজেক্ট একসটেন্ড করতে পারব। পি.এইচ.ডি-র পরে পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ চালিয়ে যাব। স্যারের ইউ.জি.সি.তে অগাধ কনট্যাক্ট, ঠিক ব্যবস্থা করে দেবেন। ম্যাটার অব অ্যানাদার থ্রি ইয়ারস। তারপর তোমায় নিয়ে ঢাকায় চলে যাব।'

'ইমপসিবল! ঢাকায় গিয়ে আমি থাকতে পারব না।'

'বেশ। পি এইচ ডি কমপ্লিট করে দেশে ফিরে আমি বাইরে কোথাও, সে ইউ.এস.এ, ইউ.কে, কি অস্ট্রেলিয়ায় কোনও য়ুনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করব। আমি কনফিডেন্ট, পেয়ে যাব। সেই দেশ থেকে এসে তোমায় উড়িয়ে নিয়ে যাব। একসঙ্গে নতুন জীবন শুরু করব। প্লিজ, অনীশা!'

'তোমার বাবা-মা? তোমাদের জয়েন্ট ফ্যামিলি?'

'আই ওন্ট বদার। আই'ম কনসার্নড উইথ মাই পেরেন্টস ওনলি। আমার বিশ্বাস, তাঁরা অমত করবেন না।'

'আর আমার বাবা-মা? তাঁরা রাজি হবেন?'

'আমি—আমি রাজি করাব। তুমি কি ভাবছ, আমি মুসলমান বলে তাঁরা অ্যাগ্রি করবেন না? অনীশা, আমার তা মনে হয় না। আঙ্কল-আন্টি যথেষ্ট এনলাইটেনড পার্সনস। এই টুয়েন্টিফার্স্ট সেঞ্চুরিতে এটা কোনও ব্যাপারই নয়। ধর্ম-জাত-পাত সব বোগাস।'

অনীশা চুপ।

'কী ভাবছ? তুমি কনফিউজড? বেশ। ধর্ম নিয়ে যদি কোনও প্রবলেম অ্যারাইজ করে, আয়াম রেডি টু চেঞ্জ মাই রিলিজিয়ন। মন্দিরে গিয়ে হিন্দু হব। তারপর বিয়ে করব।...'

হল না। এই কথাগুলোই সেদিন বিকেলে ওদের বাড়িতে গিয়ে বলেছিল জুয়েল। স্ট্যাম্প পেপারে উকিলের সামনে লিখে দিতেও রাজি ছিল। বাবা-মা দুজনের কেউই একচুল নড়লেন না। স্পষ্ট বলে দিলেন, সোসাইটি মেনে নেবে না। ওদের সোসাইটিতে যে স্টেটাস আছে, সেটা নষ্ট করতে রাজি নন।

থমথমে মুখে জুয়েল সেই যে সেদিন বাড়ি থেকে চলে গেছিল, তারপর থেকে তার সঙ্গে অনীশার কখনও দেখা হয়নি। স্যারকে জিগ্যেস করেছিল অন্য বন্ধুরা। স্যার বললেন, হঠাৎ ঢাকা থেকে ওর দাদুর শরীর খারাপের খবর পেয়ে ফিরে গেছে। ওখান থেকেই পেপার পাঠাবে। আপাতত: আর ফিরছে না।

আর কখনও ফেরেনি জুয়েল। আচমকা শকে অনীশা ডিপ্রেশনে ঢুকে পড়েছিল। কিছুতেই ভুলতে পারছিল না জুয়েলকে। সাইকিয়াট্রিক ট্রিটমেন্ট করে প্রায় তিন মাস লেগেছে স্বাভাবিক হতে।

সেইসময় মায়ের কাছে শোনা ওদের এক রিলেটিভের ঘটনাও ওকে স্বাভাবিক হতে অনেকটা সাহায্য করেছিল।

মায়ের সেই দূরসম্পর্কের বোন প্রেম করে বিয়ে করেছিল মুসলমান যুবককে। বোনের নাম অর্চনা, ছেলেটির নাম আরিফ। অর্চনার চাপে আরিফ মন্দিরে গিয়ে মাথা ন্যাড়া করে নাকি হিন্দু হয়েছিল। হিন্দু ধর্মমতেই ওদের বিয়ে হয়। আরিফ হয় অমিত।

বিয়ের কিছুকাল পরে অমিত চাকরি নিয়ে দুবাই চলে যায়। অর্চনা সঙ্গে যায়। অর্চনা যখন প্রেগন্যান্ট, অমিত শাশুড়িকে টিকিট পাঠিয়ে নিয়ে আসে দুবাইয়ে।

ওদের ফ্ল্যাটে গিয়ে চমকে উঠেছিলেন মা!

কোথায় হিন্দু, কোথায় ঠাকুর ঘর! সারা বাড়িতে মক্কা-মদিনা-কাবার ছবি। অমিত ফিরে গেছে আরিফে, অর্চনা হয়েছে আফসানা!

অর্চনার কাছে মা শুনলেন, দুবাই যেহেতু ইসলাম রাষ্ট্র, ভালো চাকরি পেতে বাধ্য হয়ে নাকি ধর্ম চেঞ্জ করতে অমিত বা আরিফকে নাকি হয়েছে। ঘরের এককোণে চোখের আড়ালে অবশ্য ছোট্ট একটা সিংহাসনে কয়েকটি বিগ্রহ ও দেবদেবীর ছবি শোভা পাচ্ছিল!...

চোখের সামনের স্ক্রিনে মাধবী দোল খাচ্ছে দোলনায়...সৌমিত্র গান গাইছে...কিছুই দেখছে না অনীশা। দেখতে পাচ্ছে না।

জুয়েল, আবার জুয়েল!

পার্থ আসবে ওকে রিসিভ করতে।

'ম্যাম, শুড আই টেক ইট? হ্যাভ য়ু ফিনিশড?'

এয়ারহোস্টেস এসে গেছে। সামনে ব্রেকফাস্ট, আধখাওয়া পড়ে আছে।

'ইয়েস। আই'ল নট টেক।'

এয়ারহোস্টেস তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছিল। অনীশা ডাকল, 'একসকিউজ মি'।

এয়ারহোস্টেস ঘুরে দাঁড়াল।

'ইফ য়ু ওনট মাইন্ড, ক্যান য়ু সার্ভ মি ওয়াইন? আই ওয়ান্ট টু স্লিপ...ডিপ স্লি...।'

এয়ারহোস্টেস বড়-বড় চোখে তাকাল। এই লেডি এতক্ষণ ফ্লাইটে শুধুমাত্র ফ্রুট জুস নিয়েছে।

অনীশা বন্ধুদের কাছে শুনেছে, ওয়াইন অতি বিস্বাদ হলেও নিদ্রাকর্ষক। এই মুহূর্তে ও ঘুমিয়ে পড়তে চায়। বাকি সফর সিট থেকে উঠবেই না।

ঘুম আসার আগেই যদি জুয়েল এসে দাঁড়ায় ওর সিটের সামনে? না। চেনার কোনও প্রশ্ন নেই। স্ট্রেট ডিনাই করবে। দ্যাটস দ্য ওনলি অপশন।

সবুজ রঙের বোতল ও গ্লাস এল ট্রে টেবিলে। ছিপি খুলে ঢকঢক করে বোতল থেকেই লাল পানীয় সরাসরি গলায় ঢালতে লাগল অনীশা। আয় ঘুম...আয় ঘুম...ঘুম আয়রে...।

অ্যানাউন্সমেন্ট শুরু হয়ে গেছে। 'উইদিন আ ফিউ মিনিটস আওয়ার ফ্লাইট উইল ল্যান্ড ইন দ্য জে.এফ.কে এয়ারপোর্ট। নাও নিউ ইয়র্ক টাইম ইজ সিক্স-থার্টি। প্যাসেঞ্জারস আর রিকোয়েস্টেড...'

গভীর অতল থেকে সোজা হয়ে উঠে বসল অনীশা। সিট বেল্ট বেঁধে ফেলল।

কাচের বাইরে ভোরের নরম আলো। পৃথিবীর অন্য গোলার্ধে এসে গেছে।

মস্তিস্ক আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে...হ্যাঁ, জুয়েল! নামার সময় বা তার পরে তো দেখা হওয়ার চান্স নাইনটি নাইন পার্সেন্ট। তখন? পার্থকে দেখে কী কী বলতে পারে সে? পার্থ কি একটুও কনফিউশনে পড়বে না?

'চিনি না আপনাকে' বলে সরাসরি অপমান করে দেবে? পারবে? জুয়েল কি কিছু অন্যায় করেছিল ওকে ভালোবেসে?

ফ্লাইট ল্যান্ড করেছে। প্যাসেঞ্জাররা উঠে দাঁড়িয়েছে। অনীশাও তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়াল। চিরকুট এসেছিল অনেকটা পিছন থেকে। আগে-আগে ওকে বেরিয়ে পড়তে হবে। জুয়েলের দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে হবে।

ইমিগ্রেসনের ভদ্রমহিলা একটু খেঁকুরে প্রকৃতির। নানাবিধ প্রশ্ন সামলে লাগেজ নেওয়ার কনভেয়ার বেলটের সামনে পৌঁছতে একটু দেরি হয়ে গেল।

এর ফাঁকে মাঝে-মাঝে অনীশা সন্তর্পণে আড়চোখে দেখেছে এদিক-ওদিক। জুয়েলকে চোখে পড়েনি।

পাঁচ ডলার ফেলে একটা ট্রলি নিয়েছে। তার ওপর ঢাউস ব্যাগেজ চাপিয়ে বাঁ দিকে গ্রিন চ্যানেলের দিকে এগোল।

লক্ষ করেনি, ওর ঠিক পিছনে-পিছনে একজন দীর্ঘদেহী পুরুষও এগোচ্ছিল।

গ্রিন চ্যানেল ক্রস করে কাঁচের দীর্ঘ করিডরের সামনে এসে দাঁড়াল অনীশা। পার্থকে এখনও দেখা যাচ্ছে না। দুদিক দিয়েই বেরোন যায়। কোনদিকে বেরোবে? ওই যে লেখা আছে, একদিকে মেট্রো-বাস, অন্যদিকে ক্যাব।

ঠিক সেইসময় পাশ থেকে সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর, 'কী ম্যাডাম, পুরো ফ্লাইটে একবারও রেসপন্ড করলে না?'

অনীশা কেঁপে উঠল। জুয়েল! ওর একেবারে পাশে। উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা পাচ্ছে না, হাত-পা হঠাৎ অবশ হয়ে যাচ্ছে।

'আমি কি দূস্টু কথা বলারও যোগ্য নই? একটু জিগ্যেসও করতে পারি না, এদেশে কেন এসেছ?'

'পড়তে।' অনীশা অতি কষ্টে বলল। কেন যে ভেতর থেকে লাভার মতো আবেগ ঠেলে বেরোতে চাইছে, থামাতে পারছে না।

'বা:! পোস্ট ডক্টরেট, না ডক্টরেট?'

'হিসেব ভুল হচ্ছে কেন?' আস্তে-আস্তে স্বাভাবিক হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে অনীশা, 'ডক্টরেট।'

'ও তাই তো। সরি। কোথায় যাবে এখন?'

'নিউ জার্সিতে। একজন আসবে নিতে।'

'একজন! গুড। চলো, তোমায় এগিয়ে দিই।'

'দরকার নেই।...বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকবে।'

'সেটা কনফার্ম করে নিই। অনীশা, এই দেশ, এই দ্বীপ যেমন সুন্দর, তেমনই নিষ্ঠুর। চলো।...'

'ত-তুমি? তুমিও কি রিসার্চ...'

'না অনীশা। এবার তুমিও ভুল করলে। আমি তোমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। পোস্ট ডক্টরেট করে চাকরি করছি। দেশে গিয়েছিলাম, আব্বু অসুস্থ। দেখতে।'

'নিউ ইয়র্কেই বাসা?'

'হ্যাঁ। তিন বছর হয়ে গেল এই নির্বাসনে, এই যন্ত্র-জীবন কাটাচ্ছি। জানি না, আর কতদিন থাকতে হবে। তুমি ভালো আছ অনীশা?'

হঠাৎ দুচোখ ঝাপসা হয়ে গেল অনীশার।

'জানি না!...আমি জানি না।'

'আমিও জানি না।' জুয়েলের কি দীর্ঘশ্বাস পড়ল? কেন?

দূর থেকেই হাত নাড়ছিল পার্থ, 'অনীশা। এদিকে। এদিকে আমি।'

পাশে দীর্ঘদেহী অচেনা পুরুষকে দেখে ওর হাত নাড়া থেমে গেল।

পার্থর ঠিক বাঁদিকে একটু দূরে একজন বিদেশিনী সিগারেট টানছিল। সে এগিয়ে এল।

জুয়েল সরাসরি পার্থর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'হাই। আমি জুয়েল।'

'আমি পার্থ। অনীশাকে নিতে এসেছি।'

'জানি। অনীশা বলেছে। কলকাতার বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজে ও আমার প্রিয় ছাত্রী ছিল।...নাও, লেট মি ইন্ট্রোডিউস ইলিনা, মাই অ্যামেরিকান পার্টনার।...ইলিনা, দিস ইজ পার্থ অ্যান্ড অনীশা।...চলি অনীশা। পার্থ, ভালো থাকবেন। এই শহরে ঠিক দেখা হয়ে যাবে।

কেলেংকারি

সাতসকালেই ঘোর বিপর্যয়।

বাজার নামিয়ে ডাইনিং টেবিলে খবরের কাগজ নিয়ে বসেছেন। মানদার মা চা দিয়ে গেল। চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে খেয়াল হল, ফোনটা করা দরকার। রোজ ভুলে যাচ্ছেন। ডাইরি থেকে নাম্বার দেখে মোবাইল থেকে মোবাইলে ফোন করলেন। তারপরেই পরপর তিনটে অঘটন ঘটল।

বিচ্ছিরি বিষম খেয়ে মাথার ঘিলু নড়ে গেল।

হেঁচকি শুরু হয়ে গেল—হিঁচিক...হিঁক...

চায়ের কাপ চলকে উঠে আধকাপ গরম চা পড়ল সাদা পাজামায়।

এক যাচ্ছেতাই পরিস্থিতি!

উরুর কাছটা জ্বলে যাচ্ছে। চায়ের এই গুণ, পুলিশের ডান্ডার মতো। ফোস্কা পড়ে না। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। ভিতরে নুনছাল ওঠার জ্বলুনি।

পরিস্থিতি সামলাতে পরপর দু-গেলাস জল খেয়ে ফেলতে হল।

প্রায় পাঁচ মিনিট পর কিছুটা ধাতস্থ হলেন বিশ্বজিৎ।

ঠিক নাম্বারে ফোন করেছেন তো? ডায়েরির সঙ্গে আবার মেলালেন। হু, নাম্বার ঠিকই আছে।

তবে?

বিশ্বজিৎ মনে করতে চেষ্টা করলেন মহিলার সাম্প্রতিক হাবভাব।

পরশুদিনই দেখা হয়েছে। অফিস থেকে ফেরার পথে তৃণাকে আনতে গেছিলেন।

একটু বেশি হাসছিল কি? চোখের মধ্যে কোনও ইশারা ছিল কি?

কিন্তু বিশ্বজিতের নাম্বার পাবে কোত্থেকে? তৃণার কাছ থেকে নিয়ে সেভ করে রেখেছে? না, মেয়েকে জিগ্যেস করা সমীচীন হবে না। আজকালকার মেয়েরা এগারো বছরেই পেকে লাল। কী ভেবে বসবে, ঠিক নেই।

বিশ্বজিতের জ্বালা-ব্যথা কিন্তু উধাও। বরং অনেককাল পরে মনের মধ্যে অন্যরকম সুর গুনগুনিয়ে উঠছে। শরীর ছেড়ে দিয়েছে। অফিস যেতে ইচ্ছে করছে না। খালি ঘুরে-ঘুরে আসছে কথাগুলো।

বেশ সাহসী মহিলা!

তৃণা যখন দু-বছরের শিশু, দু-দিনের জ্বরে ওর মা চলে গেল। তারপর কত চাপ এসেছে, বিশ্বজিৎ ঘুরেও তাকাননি। তৃণার সৎমা আসবে, ভাবতে পারেননি।

দেখতে-দেখতে ন'টা বছর কেটে গেছে। বিশ্বজিৎ একাই মেয়ের মা-বাবা হয়ে সবদিক আগলেছেন।

আজ এসব কী কাণ্ড হচ্ছে? আশ্চর্য ব্যাপার, মনটাও মোটে নিজের বশে আসছে না।

তৃণা পড়াশুনোয় ভালো। দু-বছর হল, খোঁজখবর নিয়ে ওকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন বাসবী ম্যাডামের কোচিং-এ। কোচিং-এর বেশ সুনাম।

বাসবী একা থাকে। একটা নার্সারি স্কুল চালায় আর ছাত্রী পড়ায়।

বছর পঁয়ত্রিশ বয়েস। বিয়ের দু-বছরের মাথায় স্বামী মারা যান। আর বিয়ে করেনি। সুশ্রী, হাসিখুশি, ব্যক্তিত্বসম্পন্না। পড়ানো নিয়েই আছে। কেউ কোনওদিন ওর চরিত্র নিয়ে সামান্য কিছুও বলতে পারেনি।

বিশ্বজিতের কেমন পাগল-পাগল লাগতে লাগল। পরশুর দেখা হওয়াটা ভালো করে ভাবতে চেষ্টা করছেন। এখনও কানে বেজে যাচ্ছে সেই মিষ্টি গলা।

একটু আগে বিশ্বজিৎ স্রেফ তৃণার পড়াশুনোর খবর নিতে ফোন করেছিলেন। অন্যান্যবার সামনা-সামনি জিগ্যেস করেন। পরশু অন্য গার্জিয়ানরা ছিল। তাই করেননি।

ফোন তুলে কী-কী পয়েন্টে কথা বলবেন, মোটামুটি ঠিক করে রেখেছিলেন।

বাসবী সুযোগ দিল না। সব গুলিয়ে যা-তা হয়ে গেল।

বিশ্বজিৎ শুধু বলেছিলেন,—হ্যালো।

ব্যস! অমনি অন্য দিক থেকে সুরেলা গলা ভেসে এল,—ওহ আই লাভ য়ু বি...

এরপর আর কী বলেছে, কানে ঢোকেনি বিশ্বজিতের। ততক্ষণে সর্বনাশ হয়ে গেছে। ফোন কানেই থেকে গিয়েছে। চা চলকে, বিষম-হেঁচকি সহযোগে বিশ্বজিৎ বেসামাল।

—কী হল বাপি, অফিস যাবে না?

—নারে। শরীরটা জুৎ লাগছে না।

—কেন? কী হল বাপি? সকালে তো দিব্যি মর্নিংওয়াক করে, বাজার নিয়ে ফিরলে!

—সেই তো। তারপর থেকেই বড় ক্লান্ত লাগছে।

—সে কী! ডাক্তারকাকুকে খবর দিই।

এই রে! বিশ্বজিৎ সতর্ক হলেন।

—নারে তিনু, তেমন কিছু না। একটু শুয়ে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে।

—না-না বাপি, একবার ডাক্তারকাকুকে বলি। প্রেসারটা দেখে যাক।

বলেই ফোনটা ওঠাতে যাচ্ছিল তৃণা, তাড়াতাড়ি ওকে থামালেন বিশ্বজিৎ। এ তো মহা ক্যাচাল হল। বাড়িতে ছুটি নিয়ে 'ব্যাপারটা' নিয়ে একটু খোয়াব দেখবেন ভেবেছিলেন, তা আর হওয়ার নয়। তৃণাদের স্কুলে আজ জন্মাষ্টমীর ছুটি। বাড়িতে শুয়ে থাকলে তৃণা নির্ঘাত ডাক্তার দেখিয়ে ছাড়বে। তার চেয়ে—

—না:! অফিস কামাই করব না, বুঝলি। এখন শরীরটা ফিট লাগছে।

তৃণা হাঁ করে দেখছে। নিজেকে প্রাণপণে গোপন করতে-করতে উঠে পড়লেন বিশ্বজিৎ। মেয়েদের চোখ বড় সাংঘাতিক! ভেতর পর্যন্ত পড়ে ফেলে।

বাথরুমে শাওয়ারের নীচে চান করতে-করতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। পুরোনোদিনের সেইসব গান উড়ে-উড়ে আসতে লাগল। 'এই কূলে আমি আর ওই কূলে

তুমি...' 'সারাদিন তোমায় ভেবে হল না আমার কোনও কাজ...'। দু-এক কলি বিড়বিড় করে গেয়েও ফেললেন।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। সম্পূর্ণ আনমনা। অভ্যেসবশে ব্যারাকপুর স্টেশনের কাছে এসে খেয়াল হল। ধ্যুৎ! আজ কিছুতেই অফিসে যাবেন না।

উলটোদিকে দাঁড়ানো একটা সাইকেল-রিকশায় উঠে বসলেন। 'চলো গান্ধীঘাট।' রিকশাওয়ালা মুখচেনা। অবাকচোখে তাকাল। তাকাক গে! আমি কোথায় যাব, তোর কী রে বাপু?

নদীতীরে বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে সুন্দর পার্ক হয়েছে। সারি-সারি বসার জায়গা। এত কাছে, অথচ সাজানোর পরে এদিকে আর আসা হয়নি।

গঙ্গায় জোয়ার। ঢেউ উঠছে তির-তির...। দু-চারটে নৌকো দোল খাচ্ছে। ঠিক বিশ্বজিতের মনের অবস্থা। আকাশ মেঘলা। নীল ছায়া নেমেছে জলে। হা-হা হাওয়া। একটুও গরম নেই।

বিশ্বজিৎ মাঝে-মাঝে আরামে চোখ বুঁজে ফেলছেন। একটা ফোন, তিনটে শব্দ জীবনের রংটা বদলে দিল!

বাসবী 'ম্যাডাম' তাকে প্রোপোজ করল। হ্যাঁ, প্রোপোজ ছাড়া এটা আর কী! মহিলার সাহস আছে বলতে হবে। সরাসরি জানিয়ে দিয়েছে।

এবার পরপর স্টেপগুলো ভেবে নিতে হবে। তারপর চটপট করণীয় কাজটা সেরে ফেলতে হবে। সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর তৃণা। তৃণা রাজি হবে তো? বাসবীকে শিক্ষিকা হিসেবে ও খুব পছন্দ করে, শ্রদ্ধাও করে। সে একরকম। কিন্তু বাবার পাশে? কথা বলতে হবে। দরকারে বোঝাতে হবে।

ধরে নেওয়া যাক, মেনে নিল। কিন্তু আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব...তারা? এত বছর পরে বিশ্বজিতের হঠাৎ এই পরিবর্তন—

দু-র! যে যা খুশি বলে, বলুক গে! কী যায় আসে। অত ভাবলে চলে! সবার মুখ বন্ধ করা যায়?

আসল কথা হল, বাসবীকে তার ভালো লাগে তো?

অমনি চশমা পরা ফরসা মুখখানা ভেসে উঠল। হাসলে গালে টোল পড়ে। শিহরিত হলেন বিশ্বজিৎ। হ্যাঁ, ভালো লাগে। আগেও লাগত। আগে কোনওদিন ভাবেননি।

—আরে বিশ্বজিৎবাবু, এখানে?

চমকে ঘাড় ঘোরালেন। পান্নালালবাবু। মর্নিংওয়াকের এক সঙ্গী। রিটায়ার্ড সরকারি আমলা।

বিশ্বজিৎ থতমত খেয়ে বোকার মতো হাসলেন। শ-শালা! একটু নিরিবিলি থাকার জো নেই। এখানেও পরিচিত মুখ।

—অফিস যাননি?

আমি যাব কি না-যাব, তোর কীরে বুড়ো ভাম?

—না। মানে হঠাৎ ছুটি নিতে ইচ্ছে করল।

—অ। আমি তো মশাই, আপনাকে দেখে অবাক। প্রথমে ভাবলাম, ভুল দেখছি। কতক্ষণ এসেছেন?

হতচ্ছাড়া! তোকে কৈফিয়ত দেব কেন রে?

—অনেকক্ষণ। এবার উঠব।...চলি।

বুড়োর আদ্যশ্রাদ্ধ করতে-করতে উঠে পড়লেন। সামনের পথ দিয়ে একটা সাইকেল রিকশা যাচ্ছে। থামিয়ে চেপে বসলেন।

উফ! কোথাও দু-দণ্ড শান্তি নেই। এখন কোথায়? বাসবীর বাড়ি? দুপুর দুটো। কোথায় থাকবে? বাড়িতে, না স্কুলে?

তার চেয়ে আগে একটা এসএমএস পাঠানো যাক। আজকালকার ছেলেপিলেদের মতো।

—বাবু, কোনদিকে যাবেন?

—স্টেশন।

মোবাইলে পুটপুট করে বোতাম টিপতে শুরু করেছেন। 'আই লাভ য়ু টু।' শরীরে কাঁটা দিচ্ছে। 'সেন্ড' টিপলেন। চলে গেল মেসেজ।

এবার? ফোন আসবে?

—বাবু।

ঘোর কেটে গেল। পার্স থেকে দশটাকার নোট বের করে হনহন করে হাঁটা দিলেন স্টেশনের দিকে।

স্টেশন চত্বর ফাঁকা। অল্প কিছু প্যাসেঞ্জার বসে আছে। কিছু কুলি চাদর পেতে ঘুমোচ্ছে।

ফোন! ফোন বাজছে! নাহ! এ তো তৃণা।

—বাপি, তুমি ঠিকঠাক? কোনও প্রবলেম নেই?

—নারে। একদম ফাইন।

—বাপি, তুমি আসার সময়ে শাহজাদা থেকে মাটন বিরিয়ানি আনতে পারবে? খুব ইচ্ছে করছে।

—নিশ্চয়ই আনব। সঙ্গে আর কিছু?

—উঁ...চিকেন মশালা—

—সিওর!

—থ্যাঙ্কিউ বাপি। টা-টা।

একটা ফাঁকা বেঞ্চি দেখে গিয়ে বসলেন।

ফোন! আবার ফোন বাজছে। অ্যাঁ—এই তো! এই তো সেই নাম্বার। বাসবী!

গলাটা একটু কেঁপে গেল,—হ্যা-লো।

—হ্যালো! কে আপনি?

—অ-আমি বিশ্বজিৎ।

—বিশ্বজিৎ? কোন বিশ্বজিৎ?

—না-মানে...বাসবী আমি—

—হোয়াট? বাসবী! আপনার স্পর্ধা দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমায় নাম ধরে ডাকার রাইট আপনাকে কে দিল?

—না-মানে অ-আপনি আজ—

—আজ কী? আপনাকে চিনি না, জানি না, আপনি একজন ভদ্রমহিলাকে নাম ধরে ডাকছেন? জানেন এখনই এই নাম্বার পুলিশকে দিয়ে আপনাকে জেলে পুরতে পারি 'ইভটিজিং'-এর জন্যে।

—আপনি বোধহয় ভ-ভুল করছেন! ম-মানে ব-বোধহয় কোথাও ভুল হচ্ছে।

—কী ভুল হচ্ছে? জানেন আমার প্রফেশন?

—জ-জানি। আপনি পড়ান। টিচার।

—ও! সব জেনেশুনে ফোন করছেন! তার মানে...তার মানে...আপনি একটি ইতর ছোটলোক। আমি..আমি...

—অ-আপনি শুধু-শুধু একসাইটেড হচ্ছেন! আজ সকালে আপনাকে আমি ফোন করেছিলাম। আপনি ইয়ে—

—রাবিশ! আপনি কোথায় থাকেন?

—ইয়ে মানে ব্যারাকপুরে। ম্যাডাম, একটা কথা বলব?

—কী বলবেন?

—আমি একটু দেখা করতে চাই আপনার সঙ্গে। আপনি এখন স্কুলে, না বাড়িতে?

—স্কুলে। কিন্তু কী করতে আসবেন? আপনার মতো জঘন্য লোকের সঙ্গে দেখা করব, ভাবলেন কী করে?

—শুনুন,শুনুন। প্লিজ। দেখলে আমায় চিনতে পারবেন। বিশ্বাস করুন, কোথাও গোলমাল হয়েছে। আমার মেয়ে তৃণা আপনার কোচিং-এ পড়ে।

—সে কী! আপনি তৃণার বাবা? ছি:-ছি:। আপনি তলে-তলে এত হীনপ্রবৃত্তির লোক!

—ও ম্যাডাম, প্লিজ। আমায় একবার দেখা করার সুযোগ দিন। আমি এখনই যাচ্ছি!

দরদর করে ঘাম বেরুচ্ছে শরীর দিয়ে। সর্বনাশ। কী থেকে কী হয়ে গেল! কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। গভীর রহস্য। সকালে এই মহিলা মধুঢালা গলায় প্রোপোজ করল, আর এখন! বাঘিনীর মতো ফুঁসছে! ডা: জেকিল আর মি: হাইড? যদি তৃণাকে বলে দেয়? কিংবা যদি বলে ওকে আর পড়াবে না, তখন?

একতলায় স্কুল, কোচিং। দোতলায় একখানা ঘর। দুপুরে রেস্ট নিয়ে সন্ধে থেকে আবার পড়ানো শুরু হয়।

গ্রিল গেট পেরিয়ে কলিংবেল টিপলেন বিশ্বজিৎ। ঊর্ধ্বশ্বাসে পৌঁছে গেছেন। জামা ভিজে সপসপ করছে।

আধমিনিটের মধ্যে তরতর করে নেমে এল বাসবী। ফরসা মুখ রাগে থমথম করছে। কোলাপসিবল টেনে একপাশে সরে দাঁড়াল।

—ঢ-ঢুকব?

—আসুন! ছি:-ছি:, আপনাকে আমি এতদিন ধরে চিনি। ভদ্রলোক বলেই জানতাম। তৃণার মা নেই, ওকে আমি খুব স্নেহ করি। সব কথা বলে আমাকে। আপনাকে কী অসম্ভব ভালোবাসে, রেসপেক্ট করে। কথায়-কথায় শুধু বাপি। সেই আপনি—ছি:-ছি:, আপনার মনে এত নোংরা ভাবনা—

—প্লিজ ম্যাডাম। আমায় একটু বলতে দিন।

আর সহ্য করতে পারছেন না বিশ্বজিৎ। কোনও মহিলার কাছ থেকে এইরকম 'মধুর সম্ভাষণ'! দু:স্বপ্নেও ভাবেননি কোনওদিন। মাথা টলটল করছে।

—আজ সকালে আমি আপনাকে ফোন করেছিলাম। এই যে দেখুন, আটটা কুড়ি মিনিটে। তৃণার লেখাপড়ার বিষয়ে কিছু জিগ্যেস করার ছিল। ফোন করে আমি 'হ্যালো' বলতেই অ-আপনি...বিশ্বাস করুন, বললেন 'ও আই লাভ য়ু বি...'

—কী! কী বলেছি?

—বিলিভ মি, ওইটুকু শুনেই আমি ফিনিশ হয়ে গেছি। তারপর আর কিছু কানে ঢোকেনি। তারপর যে কী অবস্থা... ইয়ে...হয় আমি...

হঠাৎ বাসবীর মুখটা নরম হয়ে গেল। রাগ-টাগ কিচ্ছু নেই, বরং কেমন যেন লাজুক-লাজুক লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে।

সামনের চেয়ার দেখিয়ে একেবারে অন্যগলায় বলল,—বিশ্বজিৎবাবু, প্লিজ বসুন। আমি একসট্রিমলি সরি বিশ্বজিৎবাবু। প্লিজ, কিছু মনে করবেন না।

মুখখানা লজ্জায় ঝুঁকে পড়েছে। বিড়বিড় করে বলল, সব দোষ আমার। বুঝতে পেরেছি। আমি তখনই সৃজাকে বললাম, করব না। মেয়েটা এমন নাছোড়বান্দা হয়েছে।

—সৃজা কে?

—আমার ভাইঝি। দাদার একমাত্র মেয়ে। খুব জেদি। পরশু এসেছিল। বলল, নতুন একটা এফ-এম চ্যানেল দশহাজার টাকা প্রাইজ দিচ্ছে। এসএমএস করে মোবাইল নাম্বার

রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। তারপর অচেনা নাম্বার থেকে যখন-তখন ফোন করবে ওরা। হ্যালো বলতেই বলতে হবে 'ও আই লাভ য়ু বি-১০১'! সঙ্গে-সঙ্গে টাকা। এখনও পর্যন্ত নাকি পঁচাত্তরজন পেয়েছে। আমি...আমি...

লম্বা শ্বাস পড়ল বিশ্বজিতের।

—বুঝেছি ম্যাডাম। ঠিকই। ওরা বি-১০১ এফএম চ্যানেল পপুলার করার জন্যে প্রাইজের ড্রাইভ দিয়েছিল। আপনি অচেনা নাম্বার দেখে ভাবলেন, নিশ্চয়ই ওরা।

—ঠিক তাই বিশ্বজিৎবাবু। আমি অন্য কোনও মিন করে—প্লিজ বিশ্বজিৎবাবু, যা হয়েছে ভুলে যান। একসকিউজ করে দিন। ভুল বুঝে একটু আগে আমি আপনাকে যা-ইচ্ছে-তাই বলেছি। প্লিজ!

—আরে না-না ম্যাডাম। এত করে বলবেন না। ভুল হতেই পারে। যদি অভয় দেন, একটা কথা বলি। রেগে যাবেন না। বকাঝকা করার আগে সকালে ভুল ভেবে যেটুকু বলেছিলেন, তাতে আমার দিক থেকে কিন্তু কোনও প্রবলেম হয়নি।

বাসবী অদ্ভুতচোখে মুখ তুলে তাকাল।

—মানে?

—আই সোয়্যার। অনেক-অনেক বছর পরে আপনার ওই কথাগুলো আমার বয়েস পাক্কা কুড়ি বছর কমিয়ে দিয়েছিল। আজ আমি অফিস যাইনি। যেতে একদম ইচ্ছে করেনি। ঘুরেছি এদিক-ওদিক। যাকগে, এখন কোনও কনফিউশন নেই। চলি ম্যাডাম।

বিশ্বজিৎ উঠে দাঁড়ালেন। বাসবী এখনও একদৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছে। তার মুখে লাল আভা আরও গাঢ় হয়েছে। কয়েকমুহূর্ত কেটে গেল নি:শব্দে। ঘরের মধ্যে শুধু ঘড়ির কাঁটার টিকটিক।

তারপর অস্ফুটে বলল,—আপনি...আপনি আমার...আমার যে সব ওলটপালট হয়ে গেল। একজন কেউ এতদিন পরে...আমার জন্যে...একটা কথা বলব?

বিশ্বজিৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন।

—আচ্ছা, ধরুন এই ভুলটা যদি সত্যি হয়?

—সত্যি? সত্যি ভেবেই তো আমার কথা বলে দিয়েছি। আরও কি স্পষ্ট করে বলতে হবে?

গ্রিন কার্ড

এখনও সূর্য ডোবেনি।

সুজন সদ্যবিবাহিত বউকে নিয়ে ওয়ালমার্টে ঢুকে পড়ল। বলল, 'ফার্স্টফ্লোরে মেইনলি জুয়েলারি, পারফিউম আর কসমেটিকস। সেকেন্ডফ্লোরে ড্রেস মেটিরিয়ালস, শু্য, ওয়াচ আর লেদার গুডস। থার্ড ফ্লোরে পাবে গ্রসারি, কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স...'

বৈশাখী 'হাঁ' হয়ে দেখছিল। সুজনের কথা কানে ঢুকছিল না। এ যে স্বপ্নরাজ্য! 'শপিং মল' যে এত বিরাট-বিপুল হতে পারে, ধারণাতেই ছিল না। এক-একটা শপে থরেথরে পৃথিবীর সেরা সব ব্র্যান্ড ঝলমল করছে। চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে।

'শুনছ? কী করবে?'

'উঁ?'

'বলছি কী করবে? ড্রেস মেটিরিয়াল কিন্তু দোতলায়। সেকেণ্ড ফ্লোরে।'

'হোক। একতলা শেষ করে দোতলায় উঠব।' বৈশাখী অস্ফুটস্বরে বলল। ওর বিস্ময়ের ঘোর কাটছিল না।

'তাহলে কিন্তু আজ আর সব হবে না। একতলাটা পুরো দেখতে গেলে দশটা বেজে যাবে।'

'যাক।'

'ওকে। আমার কোনও প্রবলেম নেই। তোমার দু-একটা পুলওভার আর আন্ডারগার্মেন্টেস কেনা দরকার। তোমারই কষ্ট হবে।'

'হোক। পরদিন কিনব।'

'পরদিন মানে তো নেকসট উইক-এন্ড। মাঝে আমার একদিনও অফ নেই।'

'চালিয়ে নেব। তুমি চিন্তা কোরো না।'

'বেশ। চলো তাহলে।'

সুজন বৈশাখীর দিকে তাকিয়ে হাসল। শ্রাগ করল। এই প্রথম এদেশে এসেছে বৈশাখী। ওকে দেখার নেশায় পেয়েছে।

বৈশাখীর বাড়ি টাঙ্গাইলের মফ:স্বল শহরে। দশদিন হল, বাংলাদেশ থেকে এসেছে স্বামীর সঙ্গে।

নিউ ইয়র্ক জন কেনেডি এয়ারপোর্টে পা দিয়েই ওর চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে গেছিল। সেখান থেকে ম্যানহাটনে আসতে-আসতে ওর কথা বন্ধ হয়ে গেছিল।

সুজন খুব এনজয় করছে।

ওরা পৌঁছেছিল বৃহস্পতিবার দুপুর-দুপুর। জেট-ল্যাগ কাটতে একদিন। নিজেদের এক-কামরার ফ্ল্যাটে শনি-রবি কেটেছিল হানিমুনের মতো। তার মধ্যে অবশ্য সুজন কাঁচা বাজার, সবজি-মাছ-মাংস এনে ঢুকিয়ে দিয়েছিল ফ্রিজে।

সোমবার থেকে আবার মেশিন-জীবন। সকাল আটটায় সুজন বেরিয়ে গেছে। ফিরেছে সন্ধে আটটায়। বারবার বুঝিয়ে গেছে, বৈশাখী যেন ঘর থেকে না বের হয়। বড়জোর সামনের রাস্তায় একটু হেঁটে আসতে পারে। গাড়ি-চলাচলের ব্যাপারটাও বুঝিয়েছে পইপই করে। কারণ বাংলাদেশে গাড়ি চলে বাঁদিক দিয়ে। আমেরিকায় ঠিক উল্টো, ডানদিক দিয়ে।

তারপর এটাই ওদের আউটিং-এর প্রথম শনিবার। দুপুরে ভালোমন্দ খাওয়া-দাওয়া করে একটু রেস্ট, একটু আদর। তারপর চারটে নাগাদ সুজনের ঝাঁ-চকচকে হুন্ডাই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়া।

প্রথমে এলোমেলোভাবে অনেকটা ঘুরেছে। বউকে নিউ ইয়র্কের সঙ্গে প্রাথমিক আলাপ করিয়ে দিয়েছে। দেখিয়েছে সমুদ্র, নদী-মোহানা, তিন-চারতলা ময়দানবীয় ব্রিজগুলো, ভিউ পয়েন্ট থেকে স্যাটার্ন আইল্যান্ড, অতলান্তিক মহাসাগরের মাঝে স্ট্যাচু অব লিবার্টি।

সূর্য দিগন্তরেখার কাছাকাছি পৌঁছতে চলে এসেছে টাইমস স্কোয়ারে। আলোর রোশনাই সবে সেখানে শুরু হয়েছে, ভিড়ও বাড়ছিল। সেখানে কয়েক সেকেণ্ড গাড়ি স্লো করে আবার স্পিড বাড়িয়েছে।

বৈশাখী একটু আপশোসের গলায় বলেছে, 'এখানেও থামলে না?'

'থামব গো, থামব।' সুজন হেসে বলেছে, 'এই শহরে দেখার জিনিসের শেষ নেই। তার কয়েকটা আজ ছুঁয়ে গেলাম। তোমার একটা ওভারঅল পরিচয় হল। ঠিকঠাক দেখতে হলে এক-একটা জায়গাতেই পুরো সন্ধে লাগবে।'

'এখন কোথায় যাচ্ছ?'

'ওয়ালমার্টে। দেখবে, শপিং মল কাকে বলে। ওখানে আমাদের দরকারও আছে। শীত পড়ে যাচ্ছে। অন্তত: একটা উলেন জ্যাকেট না থাকলে হঠাৎ তোমার ঠান্ডা লেগে যাবে। দেখাও হবে, কেনাও হবে।'

সুজন ঠিকই বলেছে। বৈশাখীর ঘোর কাটছে না। কী জায়গা!

একটা জুয়েলারি শপে শুধু চোখ-ধাঁধানো হিরে ঝলসাচ্ছে। গয়নাগুলোর কী কিউট ডিজাইন! বৈশাখী সম্মোহিতের মতো পায়ে-পায়ে ঢুকল। পরক্ষণে ছিটকে বেরিয়ে এল।

'কী হল?'

'বাপরে! কী দাম! ফাইভ থাউজ্যান্ড! মানে...আমাদের দেশের টাকায়...ত-তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার।'

সুজন হা-হা করে হেসে উঠল।

'তুমি হাসছ?'

'হাসব না? তুমি বাংলাদেশের টাকায় সবকিছু হিসেব করলে তো না-খেয়ে মরে যাবে। এখানে ডলার মানে টাকা।'

'তাই বলে অ্যাত? কেউ কেনে?'

'কেনে না? না কিনলে শপটা এতদিনে উঠে যেত।'

বৈশাখী চুপ করে গেল।

একতলা দেখা শেষ হতে-হতে দুঘণ্টা 'ফুস' করে উড়ে গেল।

সামনে এসক্যালেটর। বৈশাখী চলন্ত সিঁড়ির দিকে সন্দিগ্ধচোখে তাকাচ্ছে। লোকজনকে দেখছে।

'কোনও ভয় নেই। প্রথমে একটা-পা, সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়টা। ধরব?'

বৈশাখী মাথা নাড়ল। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল। পিছনে সুজন।

পাশের চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে মানুষের স্রোত নামছে।

মাঝামাঝি পেরিয়ে গেছে ওরা। হঠাৎ পাশের নিম্নগামী এসক্যালেটর থেকে একজন আমেরিক্যান মেমসায়েব চেঁচিয়ে উঠল, 'হাই খালেদ!'

সুজন চমকে তাকাল। ক্যাথরিন! প্রায় তিন বছর পরে। আজকেই?

ততক্ষণ রিফ্লেক্স অ্যাকশনে মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে, 'হাই।'

কিছুটা নিচে থেকে ক্যাথরিন আবার চেঁচাল, 'য়োর ওয়াইফ?'

'ইয়া।'

'ওয়াহ! হাউ সুইট।' ক্যাথরিন বৈশাখীর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসল। বৈশাখী কিছুই বুঝতে পারছে না। একবার সুজনকে দেখছে, একবার ক্যাথরিনকে।

একতলায় দাঁড়িয়ে পড়েছে ক্যাথরিন। সুজনরাও দোতলার এসক্যালেটরের মুখে।

সুজন কুলকুল করে ঘামতে শুরু করেছে। ক্যাথরিন দাঁড়িয়ে পড়ল কেন? উপরে উঠে আসবে নাকি? চলে যাওয়াও যাবে না। অভদ্রতা হবে। ক্যাথরিন অন্যভাবে নেবে।

যা ঘটবে, ঠাণ্ডামাথায় ট্যাকল করতে হবে।

ক্যাথরিন নীচে থেকে ইংরেজিতে বলল, 'খালেদ, তোমার ওয়াইফ মনে হয় সবে এদেশে এসেছে। তাই তো?'

'ইয়া। য়ু আর রাইট।' যথাসম্ভব শান্তভাবে সুজন বলল।

'তাহলে ও আমার কথা বুঝতে পারবে না। তুমি ওকে বোলো, শি'জ ভেরি সুইট। ভেরি বিউটিফুল। ওকে আমার খুব ভালো লেগেছে। কী নাম ওর?'

'বৈশাখী।'

'বাইসাখি? ওয়ান্ডারফুল। বাইসাখিকে বোলো, পরে আমরা কোনওদিন মিট করব। তখন অনেক গল্প হবে। ওকে?'

'ওকে ক্যাথরিন।'

'বা-বাই। সি য়ু।'

'বাই।'

ক্যাথরিন হাত নেড়ে এগিয়ে গেল। সুজন স্বস্তির নি:শ্বাস ফেলল।

'কে গো ওই মেয়েটা?'

'ক্যাথরিন। আমার বন্ধু ছিল।'

'বন্ধু ছিল? এখন নেই?'

এই রে! সুজন একটু অসতর্ক হয়েছিল, বলটা অনেকখানি 'স্পিন' করে ভেতরে ঢুকে এসেছে।

কোনওরকমে ব্যাট নামিয়ে ডিফেন্স করল, 'না-না! থাকবে না কেন? এখন আর দেখাটেখা হয় না।'

'কেন?'

দ্রুত গল্প বানাল সুজন, 'আমি নতুন অফিসে জয়েন করেছি। ক্যাথরিনও আগের অফিস ছেড়ে দিয়েছে। তখন এক অফিসে ছিলাম। রোজ দেখা হত। এখন হয় না। তাই যোগাযোগ নেই। এদেশে, দেখলে তো, এত ফাস্ট লাইফ—'

'শুধুই বন্ধু ছিল?' বৈশাখী আদুরে গলায় বলল, 'অ্যাই সত্যি বলো না, ও তোমার কেমন বন্ধু ছিল? আমি কিছু ভাবব না। এদেশে এসব হয়েই থাকে।'

'দূর বোকা! হলে তোমায় বলতাম না? ক্যাথরিন আমার চেয়ে অনেক বড়। প্রায় ফর্টি। জাস্ট ফ্রেন্ড।'

সুজন দেখল, বৈশাখী ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। চোখ অন্যকথা বলছে। অস্বস্তিতে চোখ সরিয়ে নিল।

'দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? দেখবে না? এখনও খোলা আছে। তোমার জ্যাকেট...ওই দ্যাখো, ওই শপটায় কতরকম ঝুলছে। চলো, চলো। এরপর সব বন্ধ হয়ে যাবে।'

বৈশাখী এগোল। কিন্তু ওর দেখার উচ্ছ্বাস, হাঁটার ছন্দ হঠাৎ হারিয়ে গেছে।

সুজনেরও সব বিস্বাদ লাগছে।

উ:! আরেকটু হলে—যদি ক্যাথরিন চলে না যেত, ওদের সঙ্গে জয়েন করত, কী হত? কী বাঁচা যে বেঁচে গেছে!

বড্ড সিগারেটের তেষ্টা পাচ্ছে সুজনের। বাঁদিকে একটা 'এক্সিট' সাইন জ্বলছে। কাচের বাইরে পোর্টিকোর মতো ফাঁকা জায়গা। কিছু আগুনের ফুলকি দেখা যাচ্ছে। স্মোকাররা ভিড় করেছে।

বৈশাখী অনেকটা ধাতস্থ হয়েছে, মনে হয়। অন্তত: সাময়িক। কারণ জ্যাকেটের দোকানে ঢুকে নিবিষ্টভাবে নেড়েচেড়ে দেখছে।

'বৈশাখী! তুমি এই শপের আশেপাশে থাকো। চুজ করো। আমার ভীষণ সিগারেটের তেষ্টা পেয়েছে। বাইরে স্মোকিং জোন। আমি একটু ঘুরে আসছি। প্লিজ।'

বৈশাখী দেখল। ঘাড় নাড়ল। সুজন দ্রুত হেঁটে কাচের দরজা সরিয়ে বাইরে চলে এল।

ফাঁকা অনেকটা লম্বা পোর্টিকো। বড়-বড় অ্যাশট্রে। সাত-আটজন ছেলেমেয়ে ধূমপান করছে। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা! কনকনে হাওয়া। সুমন প্রাণভরে হাওয়া টানল। এতক্ষণ এসিতেও ওর দম অটকে আসছিল।

সিগারেট বের করে ধরাল। নিকোটিন ভেতরে যেতে একটু স্বস্তি এল। পুরো সন্ধেটা মাটি। বাড়ি ফিরেও বৈশাখী ছাড়বে বলে মনে হয় না। কী কপাল! এতদিন পরে আজকেই ক্যাথরিনের মুখোমুখি!

বৈশাখী সুজনের কিছুই জানে না। জানে ওর বর আমেরিকায় ভালো চাকরি করে। গাড়ি আছে, ছোট ফ্ল্যাট আছে। ঢাকার বাড়িতে মাসে অনেক টাকা পাঠায়।

এর পেছনের কথা? সুজন যখন বাংলাদেশ থেকে প্রথম এল এদেশে? খালেদ হোসেন সুজন। টুরিস্ট ভিসা ছ'মাসে শেষ হয়ে গেল। ও ফিরল না। ততদিনে একটা পাকিস্তানি রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়েছে।

উদয়াস্ত হাড়ভাঙা ওয়েটারের খাটুনি। সাত-আটজন বাংলাদেশি মিলে এক ঘরে থাকা। আর ডলার জমানো। তার সিংহভাগ দেশে পাঠানো। দেশে বাবা-মা ছোট ভাইবোনেরা ওর মুখ চেয়ে আছে।

ফাঁকে-ফাঁকে রাত জেগে পড়া। মাথা ওর পরিস্কার। কম্প্যুটার, ম্যানেজমেন্টের কয়েকটা ছোটখাট ডিগ্রি পেল। কিন্তু পেলে কী হবে, ও যে 'ইল্লিগ্যাল ইমিগ্রেন্ট।'

অনুপ্রবেশকারী। যোগ্যতা অনুযায়ী কোনও জব পাচ্ছে না। গ্রিন কার্ড না পাওয়া পর্যন্ত পাবেও না।

তিন চার বছর কেটে গেছে। হাতে বেশ কিছু ডলার জমেছে। গ্রিন কার্ডের জন্যে অ্যাপ্লাই করবে? নাহ, কোনও চান্স নেই। করলেই আমেরিকা সরকার ঠেলে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেবে।

একটাই পথ। ওর এক বন্ধু বলল, এদেশের সিটিজেন মেয়েকে বিয়ে করতে হবে! কী করে সম্ভব? বন্ধুটি বলল, 'পেপার ওয়াইফ।' কাগজের বউ। কাগজে-কলমে রেজিস্ট্রি হবে, বউয়ের সঙ্গে অন্য কোনও সম্পর্ক থাকবে না। এজন্যে প্রতিমাসে ওই আমেরিকান মেয়েটাকে দিতে হবে নগদ পাঁচশো ডলার।

টানা তিন বছর এই কাগুজে 'বিবাহিত জীবন' কাটাতে পারলে তারপর গ্রিন কার্ডের জন্যে অ্যাপ্লাই করা যায়। কার্ড পেয়ে গেলে মিউচুয়্যাল ডিভোর্স হবে। সেই কাগজেও আগে থেকে দুজনের সই-সাবুদ করা থাকবে।

এদেশের অনেক মেয়েই নাকি এই পেশার সঙ্গে যুক্ত। সাইড-ইনকাম। বিশেষত ডিভোর্সি সিঙ্গলরা।

বন্ধুটির কাগুজে বউয়ের সূত্রে ক্যাথরিনের সঙ্গে আলাপ। অত্যন্ত ফর্মাল এবং প্রফেসন্যাল মেয়ে। যেদিন ওদের রেজিস্ট্রির নোটিশ দিল, সেদিনই কড়কড়ে পাঁচশো ডলার চেয়ে নিল।

তারপর থেকে প্রতিমাসের পয়লা সন্ধেবেলায় ক্যাথরিন টাইমস স্কোয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে। বিনা বাক্যব্যয়ে সুজন পাঁচটা একশো ডলারের নোট তুলে দিয়েছে।

বিয়ের তৃতীয় বছর শেষ হতে আর মাত্র একমাস বাকি। ওর বন্ধু পলাশ সন্ধেবেলা ঝড়ে-পড়া কাকের চেহারায় ওর রেস্তোরাঁয় এসে হাজির।

'এ কী! কী হয়েছে তোর?'

'হোম ডিপার্টমেন্ট ক্যানসেল করে দিয়েছে। আবার একবছর পরে অ্যাপ্লাই করতে পারব।'

পলাশ মাথার চুল খামচাচ্ছে।

'কেন?'

'ওরা এমন সব রিডিকুলাস কোয়েশ্চেন করেছিল, একটারও জবাব দিতে পারিনি। যেমন, তোমার বউ কী রং পছন্দ করে, কী খেতে ভালোবাসে, তোমায় কীভাবে আদর করে...আরও...আরও কী সব মারাত্মক প্রশ্ন! ত-তুই বল, আমি কী করে পারব? দুজনকে আলাদা-আলাদা প্রশ্ন করেছিল। লিন্ডাও পারেনি। সম্ভব নয়।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি! লিন্ডাকে বললাম। সে স্ট্রেট বলল, ইটস য়োর প্রব্লেম। আয়াম নট কনসার্নড। তোমার আমার সঙ্গে সিটিং দেওয়া দরকার ছিল।'

সুজন একমুহূর্ত দেরি করেনি। সেলফোনে যোগাযোগ করে সেদিনই দেখা করেছে ক্যাথরিনের সঙ্গে। পাঁচশো ডলারের কিস্তি দিয়ে খোলাখুলি কথা বলেছে ক্যাথরিনের সঙ্গে।

ক্যাথরিন হেসে বলেছে, 'ডোন্ট ওরি। বোকামি তোমার বন্ধুর। তাড়াহুড়ো করেছে। ...তোমার সময় আছে। অ্যাপ্লাই করে দাও। ইন্টারভিউয়ের একসপ্তাহ আগে থেকে রোজ সন্ধেবেলা আমরা বসব।'

'কোথায়?'

'আমার ফ্ল্যাটে। আমার মেয়ে হস্টেলে থাকে। উইক-এন্ডে আসে। আমরা উইক-ডে তে মিট করব। পাঁচ-ছদিন একসাথে সন্ধে কাটালেই জানাচেনা হয়ে যাবে। তোমার আগে আরও তিনজনকে আমি পার করেছি।'

ব্রুকলিনে ক্যাথরিনের ওয়ান বেড রুম ফ্ল্যাট। সেই সোমবার থেকে সুজন মর্নিং ডিউটি নিয়ে নিল। দুটোয় ফিরে স্নান-খাওয়া সেরে পাঁচটার মধ্যে ক্যাথরিনের ফ্ল্যাটে।

প্রফেশন্যাল মেয়েটাকে তখন নতুন করে চিনেছিল সুজন।

দু মাগ কফি নিয়ে সুজনের সামনে এসে বসেছিল ক্যাথরিন। সঙ্গে স্ন্যাকস। কফিতে চুমুক দিয়ে শুরু হয়েছিল দুজনের কথা বলা। নিজেদের জীবনের কথা, ভালো-লাগা, খারাপ-লাগা, শেয়ার করছিল নি:সঙ্কোচে।

দু-তিন দিনের মধ্যে ক্যাথরিনের সঙ্গে অদ্ভুত বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল সুজনের। সুজন খুব অবাক হচ্ছিল। এই কি সে-ই মেয়ে, যে নির্বিকার মুখ করে তিন বছর ধরে প্রতি মাসে পাঁচশো ডলার নিয়েছে ওর কাছ থেকে!

যতবার সুমন বলেছে, ওকে গ্রিন কার্ড পেতেই হবে, ভালো জব পেতেই হবে, ক্যাথরিন নিশ্চিন্ত করেছে। যখন বলেছে, ওর বাংলাদেশের আব্বা-আম্মু ভাই বোনেদের

কষ্ট, ক্যাথরিন ওর হাত চেপে ধরেছে।

'তুমি গ্রিন কার্ড সিওর পাবে খালেদ। পাস করে যাবে।'

'ক্যাথি, ওরা যদি তোমায় জিগ্যেস করে, কেন বয়েসে ছোট একজনকে বিয়ে করলে, কী বলবে?'

'বলব, বেশ করেছি। দ্যাটস নট দেয়ার ম্যাটার টু লুক আউট। আই লাইক এশিয়ান গাইস।'

'আর আমি? কী বলব?'

'বলবে, আই লাইক হার। দ্যাটস ইট—।'

চতুর্থ দিনের মাথায় ঘটল সেই ঘটনা। সেটা ছিল থার্সডে, বৃহস্পতিবার।

বিকেল থেকে টিপটিপ বৃষ্টি। সন্ধে নামার আগেই টেম্পারেচার অনেক নেমে এসেছিল।

কফির বদলে ক্যাথরিন দুটো গ্লাসে ওয়াইন ঢেলে নিয়ে এসেছিল। ওরা মুখোমুখি বসে ছিল। ক্যাথরিনকে অন্যমনস্ক লাগছিল।

'কী হয়েছে ক্যাথি? য়ু আর লুকিং আ বিট অফ মুড।'

ক্যাথরিন চুপ করে ছিল। একটু পরে বলল, 'খালেদ, আজ তোমায় একটা পরীক্ষা দিতে হবে। ভাবছি, ক্যান য়ু বিয়ার দ্যাট?'

'হোয়াই নট। কী পরীক্ষা?'

'আমি শুনেছি, তোমরা কনজারভেটিভ অ্যান্ড শাই পিপল। এই পরীক্ষায় এটা চলবে না খালেদ।'

'কী বলছ বলো তো? লিসন ক্যাথি, আয়াম রেডি ফর এভরিথিং। আই ব্যাডলি ওয়ান্ট আ গ্রিন কার্ড। ওপন আপ ক্যাথি।'

'গুড। ইয়েস! আজ আমাদের কমপ্লিট ওপনড-আপ হতে হবে। আন্ডারস্ট্যান্ড?'

'বাট উই'ভ অলরেডি ওপনড আপ টু ইচ আদার।'

'দ্যাটস মেন্টালি। আমি বলছি, ফিজিক্যাল পার্ট-এর কথা।'

'ফিজিক্যাল?' বলেই সুজন চুপ করে গেল। একটু-একটু বুঝতে পারছে, তার কানের লতি গরম হয়ে উঠছে।

'ইয়েস, মাই বেবি। আমাদের দুজনকে আনড্রেসড হতে হবে। বার্থডে স্যুটে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দুজন দুজনকে দেখতে হবে। কেন বলো তো?'

সুজন হতভম্ব চোখে চেয়ে আছে। কান-মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করতে শুরু করেছে।

'বিকজ—তুমি কি জানো, আমার শরীরের ঢাকা জায়গার কোথায় কী আছে? আইমিন, ওরা যখন সেপারেটলি আমাদের জিগ্যেস করবে, বলতে পারব? অল রিহার্সাল ফ্লপ। দিজ অফিসারস আর অ্যাওয়ার অব দিস। বিকস দিস ইস আ কমন প্র্যাকটিস ইন ইউ এস এ।'

সুজনের অসম্ভব নার্ভাস লাগছিল। ও জীবনে কখনও চর্মচক্ষে নগ্ন নারীশরীর দ্যাখেনি। ক্যাথরিনকে দেখবে?

'গট ইট। তুমি নার্ভাস হয়ে গেছ। চিয়ার আপ বেবি। দিস ইজ অ্যান একসাম। থিঙ্ক ইন দ্যাট ওয়ে।'

বলতে-বলতে খালি ওয়াইন গ্লাসটা নামিয়ে রাখল ক্যাথরিন। এগিয়ে এসে বিহ্বল সুজনের হাত ধরল।

'কাম অন বেবি। লেটস গো টু মাই বেড রুম।'

চমৎকার কার্পেট, নীল পরদা, ডবল বেড খাট, টিভি, এসি, ড্রেসিং টেবল—ওয়েল ফার্নিশড। সুজনের কিছুই চোখে পড়ছিল না। খাটে বসে পড়ল।

'ওয়েল খালেদ, আমরা কিন্তু শোব না, উই'ল নট মেক লাভ। রাইট? জাস্ট দুজন দুজনের শরীর ভালোভাবে লক্ষ করব। ওকে?'

সুজন ঘাড় নাড়ল।

'নাও টেল মি, তুমি আগে, না আমি আগে?... বুঝেছি, তুমি লজ্জা পাচ্ছ। আগে কোনওদিন এই অভিজ্ঞতা হয়নি। ঠিক আছে। আমিই খুলছি। তুমি দেখো। দেন য়োর টার্ন।'

একে-একে প্যান্ট-টপ খুলে ফেলল ক্যাথরিন। তারপর ব্রা, প্যান্টি।

চমৎকার মেদহীন ফিগার। সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। একফোঁটা সুতো নেই কোথাও। মুখে মধুর হাসি।

'দেখো। ভালো করে লক্ষ করো।...এই যে আমার থাইয়ের পাশে ব্ল্যাক স্পটটা দেখছ? ব্রেস্টের কাট-মার্কটা?'

কিছু কি দেখতে পাচ্ছে সুজন? সামনে...! ওর শরীরে আগুন জ্বলছে। নিম্নাঙ্গের অন্তর্বাস শক্ত হয়ে গেছে। চেন ছিঁড়ে যাবে। অন্যকথা ভাবার চেষ্টা করছে। পারছে না।

ক্যাথরিন হাসছে।

'নাও, ইটস য়োর টার্ন। ওপন আপ। আনড্রেস।'

সুজন উঠে দাঁড়াল। শরীর ওর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।

'ওকে। আই'ল হেলপ য়ু!'

ক্যাথরিন ওর জামার বোতামে হাত দিতেই সুজন ওর হাত চেপে ধরল। ঘরের আলোগুলি কি নিভে গেল? অন্ধের মতো জড়িয়ে ধরল সামনের নারীশরীরকে।

'ও মাই গড! য়ু গট অ্যারাওসড!...এসো বেবি, এসো।

কিন্তু শেষপর্যন্ত কিছুই হল না। বিছানায় কয়েক সেকেন্ডের দাপাদাপি। সুজন নেতিয়ে পড়ল। বিড়বিড় করে বলল, 'আমার ডিসচার্জ হয়ে গেছে।'

'প্রথমবারে সবারই হয়। এতে লজ্জার কিছু নেই।'

'আরেকবার ট্রাই—?'

'এখনই পারবে না সুজন। ঘণ্টাখানেক তোমায় ওয়েট করতে হবে। য়ু আর নভিস!'

সে রাতে নিজেদের মেসে আর ফিরতে পারেনি সুজন। ক্যাথরিনের কাছেই ডিনার করেছে। এবং শেষপর্যন্ত তৃতীয়বারে সফল হয়েছে।

ওদের পরীক্ষা ছিল পরের বুধবার। শুক্র, শনি, রবি বাদ। সোম ও মঙ্গলবার আবার এল ক্যাথরিনের ফ্ল্যাটে। ক্যাথরিনের কাছে ও প্রথম শিখল, শরীরের আনন্দ কীভাবে নিতে হয়।

'ঝনঝন-ঝন।'

তীব্র শব্দে সুজনের ঘোর কেটে গেল। সিকিওরিটি কাচের দরজার শাটার বন্ধ করছে। ও অন্ধকারে ভূতের মতো একা পোর্টিকোয় দাঁড়িয়ে আছে।

'হাই! হাই! হ্যালো!' চিৎকার করে উঠল সুজন। ছুটে গেল।

বেশ কিছু গালিগালাজ বর্ষিত হল। ওর অবশ্যই প্রাপ্য। ওয়ালমার্ট বন্ধ হয়ে গেছে। সিকিওরিটি তালা ঝোলাচ্ছে।

সুজনের মাথা খারাপ হয়ে গেল। বৈশাখী কোথায়? করিডর জনশূন্য। তিনটে ব্ল্যাক সিকিওরিটি দাঁড়িয়ে। ওকে দেখে কর্কশ একটা গালি দিল।

ছুটতে-ছুটতে নেমে এল নিচে। মেন গেটটাই কেবল খোলা ছিল। দুজন সিকিওরিটি ওকে দেখে অবাক চোখে তাকাল।

সুজনের ভ্রূক্ষেপ নেই। বৈশাখী কোথায়? সে তো কিছুই চেনে না। ওর কাছে সেলফোনও নেই।

সুনসান ফাঁকা প্রাঙ্গণ। কার পার্কিং বেশ দূরে। সুজন চিৎকার ছুঁড়ে দিল, 'বৈশাখী!'

কেউ নেই। উত্তর নেই।

সুজন পাগলের মতো ছুটছে। বৈশাখী হারিয়ে গেল?

কার পার্কিং-এর বিশাল লট! একমাত্র সুজনের হুন্ডাই দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে।

'বৈশাখী!'

কোনও উত্তর নেই।

ছুটতে-ছুটতে গাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সুজন। একবার গাড়ির চারিদিকে দেখল। যদি ঘুমিয়ে পড়ে থাকে! নাহ!

পকেট থেকে সেলফোনটা বার করল। মইদুলকে ফোন করবে? দেশের ছেলে। ট্রাফিক গার্ডে কাজ করে।

বোতাম টিপতেই অলো জ্বলে উঠেছে। ফোনে পরপর পাঁচটা মিসড কল। শুনতে পায়নি?

পাবে কী করে? ট্রাউজারের চাপে ফোনটা সাইলেন্ট মোডে চলে গেছিল।

কে ফোন করল? বৈশাখী? কোত্থেকে করল?

সঙ্গে-সঙ্গে রিং ব্যাক করল। বাজছে।

'হ্যালো খালেদ! তুমি কোথায়?'

এ কী! ক্যাথরিনের গলা। কোত্থেকে পেল ওর নতুন নাম্বার?

'হ্যালো, খালেদ? কথা বলছ না কেন?'

'ক-কী বলব? ক্যাথরিন, আমার খুব বিপদ।...আমি হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম!...বৈশাখী...আই ক্যানট ফাইন্ড হার।'

'সেই জন্যেই তো ফোন করছিলাম। বৈশাখী আমার কাছে। ওকে আমার ফ্ল্যাটে নিয়ে এসেছি।'

'তোমার ফ্ল্যাটে?'

'তা ছাড়া কী করব? মেয়েটা একা-একা ঘুরছিল। পাগলের মতো তোমায় খুঁজছিল। লাকিলি আমি তখন দোতলায় উঠেছিলাম। একটা ট্রাউজার কিনে ভুলে ফেলে এসেছিলাম একটা শপে। তখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল মল। আমরা দুজনেই দুজনকে চিনতে পারি। ওর কাছ থেকে তোমার নাম্বার নিয়ে ফোন করি। ধরলে না। তখন আর কোনও অল্টারনেটিভ ছিল না। নতুন এসেছে। শি কুড বি রেপড অ্যাট এনি মোমেন্ট। নিয়ে চলে এলাম। জানতাম, তুমি মিসড কল দেখে কলব্যাক করবে। চলে এসো। ওই একই ফ্ল্যাট। উই আর ওয়েটিং।'

'ক্যাথরিন! ক্যাথরিন, তোমায়...'

'ডোন্ট ওরি খালেদ। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, আমাদের ওই সম্পর্কের কথা কেউ জানবে না। দ্যাট ওয়জ অ্যান এমারজেন্সি। ক্লোজড চ্যাপটার।'

'না-না, ক্যাথরিন, আমি ওকথা বলতে চাইনি। আমি কীভাবে যে তোমায় থ্যাঙ্কস দেব...।'

'বুলশিট! বোকা ছেলে। কাম ইমিডিয়েটলি। বৈশাখীর সঙ্গে কথা বলবে?'

'না-না। আমি পৌঁছে যাচ্ছি।'

অনুসরণ-রহস্য

এই যে! ও মশাই! একটু দাঁড়ান প্লিজ।'

সঙ্গে-সঙ্গে সে হাঁটার গতি আরও বাড়িয়ে দিল। রাগে তার গা রি-রি করছে। ছিঃ, ছিঃ, শেষপর্যন্ত তাকে কিনা—! যা ভেবেছে, ঠিক তাই। তাকেই টার্গেট করেছে, ফলো করে আসেছে অফিসের গেট থেকে। কিন্তু কেন? অপমানের আর কী বাকি আছে? নাহ, দাঁড়াবে না। কোনও কথা শুনবে না। আর একটু এগোলেই বিবাদী-বাগ মিনি স্ট্যান্ড। ওই অব্দি পৌঁছতে পারলেই—

'আরে! কি হল কী? ছুটছেন কেন? আমি কি বাঘ-ভাল্লুক নাকি, আপনাকে খেয়ে ফেলব? এত ভিতু পুরুষমানুষ আমি জন্মে দেখিনি বাবা।'

চড়াক করে ইলেকট্রিক শক। মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, 'আপনাদের মতো...,' অতিকষ্টে আটকাল। থমকে দাঁড়াল। দাঁড়াল শুধু নয়, ঘুরে দাঁড়াল। হি হ্যাস টু ফেস দ্য সিচুয়েশন! হাত দুটো কোমরে।

'যা ব্বাবা! আপনি যে একেবারে রণং দেহি মূর্তি ধারণ করলেন।'

'বাজে কথা রাখুন। কী বলবেন, বলে ফেলুন।'

'বলছি তো। বলার জন্যেই তো লাজলজ্জার মাথা খেয়ে আপনার পিছন-পিছন আসছি। কিন্তু তার আগে কোমর থেকে হাত নামান প্লিজ।'

'বেশ।...নামালাম। তবে তার মানে এই নয় যে, আমি নরম্যাল হয়েছি। তাড়াতাড়ি বলুন, কী বলবেন। আপনাকে আমি টলারেট করতে পারছি না।'

'খুব স্বাভাবিক। আপনার জায়গায় আমি থাকলে আমারও মেন্টাল কনডিশন একই হতো। প্রথমেই আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।'

'ধন্যবাদ!'

'হ্যাঁ। আমায় চিনতে পেরেছেন বলে। একবারই দেখা হয়েছে আমাদের। সেদিন আমি শাড়ি পরেছিলাম। কপালে বিন্দি, কানে দুল, গলায় চেন। আর আজ অন্যরকম ড্রেস। প্যান্ট-শার্ট, চোখে সানগ্লাস। সহজে চেনার কথা নয়।'

'ঠিকই বলেছেন। প্রথমে লোকেট করতে পারিনি। ভেবেছিলাম, অন্য কোনও উদ্দেশ্য, মানে ওই যে পিক-আপ গার্ল-টার্ল ওইরকম আর কি। উইক-এন্ড বিকেলে আমার পেছনে ফেউ লেগেছে।'

'ইস-স-স! এ-মা! আমায় সেরকম লাগছে বুঝি?'

'লাগালাগির ব্যাপার নয়। চেহারা দেখে কি আজকাল মেয়ে চেনা যায়? কত ভদ্রফ্যামিলির মেয়ে শুনি, এইসব লাইনে নেমেছে। অফিস থেকে যেভাবে পিছু নিয়েছিলেন নি:শব্দে, ঘেমে গেছিলাম। আমি দাঁড়াচ্ছি, আপনি দাঁড়াচ্ছেন। আমি এগোচ্ছি, আপনি আসছেন। দু-তিনবারের পর চিনে ফেললাম। তখন ঝটাকসে রাগ আরও বেড়ে গেল। এটা হচ্ছেটা কী? কী চাইছেন বলুন তো?

'আমার তো কিছু বলার থাকতে পারে।'

'কী বলবেন? বলার আর কিছু বাকি আছে? সে সব তো—'

'দাঁড়ান। দাঁড়ান। আমার কথা যদি শুনতে না চান, বলার কিছু নেই। চলে যাব। আর যদি শোনেন এবং তারপরও 'না' বলেন, তাতেও আমার বলার কিছু নেই। ডিসিশন ইস ইয়োরস।'

'আমার ডিসিশন? ডিসিশন তো একতরফা নেওয়া হয়েই গেছে। তার পর বিকেলে আমার অফিস গেটের এককোণে দাঁড়িয়ে থাকা এবং ফলো করে কথা বলতে আসা...কী চাইছেন?'

'সেটাই তো বলতে চাই। কিন্তু তার আগে আমায় বলুন, আপনার সঙ্গে আলাদা কথা বলতে চাইলে আপনাকে ফলো করা ছাড়া কোনও রাস্তা ছিল আমার?'

'কেন?'

'বা: বা:! এবার আমি যদি বলি, আপনি ন্যাকা সাজছেন, সেটা কি ভুল হবে?'

'মানে?'

'মানে আবার কী! মঙ্গলবার সকালে পরপর দুবার ফোন করলাম। প্রথমবার ফোনটা কেটে দিলেন। দ্বিতীয়বার ফোনটা বেজে-বেজে কেটে গেল। আমি এস. এম. এস পাঠালাম, আই ওয়ান্ট টু টক। নো রিপ্লাই। তারপরও আমি অন্তত: দশবার ফোন করেছি এই চারদিনে। আপনার ফোন বন্ধ। সুইচড অফ।'

'হ্যাঁ, তাই। আপনার সঙ্গে কথা বলব না বলে মঙ্গলবারই আমি সিম কার্ড চেঞ্জ করে ফেলেছি। নতুন নাম্বার নিয়েছি। কী বলবেন? সান্ত্বনার জলবিছুটি লাগাবেন? 'যা হয়েছে কিছু মনে করবেন না। ভুলে যান।' আপনাকে পষ্ট বলেছি, আই হেট কনসোলেশন।'

কী বুদ্ধি আপনার! নিজে-নিজেই ভেবে নিলেন, আমি আপনাকে সান্ত্বনা দেব।'

'তা ছাড়া আর কী দেবেন? যা বলার, সে তো গত সোমবারই চুকেবুকে গেছে। আপনি যে কেন আমায় ফলো করে এলেন, আমার মাথায় আসছে না।'

'আসবে কী করে? ঘটে বুদ্ধি থাকলে তো আসবে।'

'অ্যাই! আপনার কথা কিন্তু লিমিট ছাড়িয়ে যাচ্ছে।'

'কী করবেন? চোটপাট করবেন? করুন।'

'হ্যাঁ, এবার তাই করব। তারপর লোক জড়ো হবে। পুলিশ এসে আমায় ধরে নিয়ে যাবে। আপনি তো সেটাই চাইছেন। বুঝেছি, এখনও আপনাদের শান্তি হয়নি। শুনুন, আমার মাথার ঠিক নেই। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আবার বলছি, যা বলার ঝটপট বলে ফেলুন।'

'বলতেই তো চাই। কিন্তু আপনি—যাগ্যে, একটা রিকোয়েস্ট করব? একটু ঠান্ডা হবেন?'

'ঠান্ডা? বেশ। বাট ডোন্ট ইরিটেট মি।'

'যে ঘটনাটা ঘটেছে, আই মিন, সোমবার সন্ধেবেলা আমার বাবা ফোন করে আপনার বাবাকে যা জানিয়ে দিয়েছেন, সেটা কি আপনি মেনে নিয়েছেন? ঠিক না বেঠিক, সেটা বিচার করেছেন?'

'বিচার? হা:! আমার বিচারের কথা আসছে কোত্থেকে? বিচার-টিচার যা করার, সে তো আপনার বাবা-মা একতরফাভাবে করে জানিয়ে দিয়েছেন। 'হবে না। বাতিল।' উফ! কী জঘন্য বিচার আপনাদের। সো প্রিমিটিভ! ইনকরিজিবল! ভাবতেই আমার—'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান। পয়েন্ট টু বি নোটেড। বাতিলের কারণটাকে আপনি জঘন্য মনে করেন?'

'অফকোর্স! ভাবা যায় না। টুয়েন্টিফার্স্ট সেঞ্চুরিতে একজন সিনিয়র আই.এ.এস. অফিসার, তাঁর একমাত্র মেয়ের, যে কিনা আবার কলেজের লেকচারার, তার পেকে ওঠা সম্বন্ধ তিনমাস পরে রিজেক্ট করছেন কী গ্রাউন্ডে? সরি, আপনার বাবার উচিত ইমিডিয়েটলি রিজাইন করে কোনও গ্রামে গিয়ে হাল চাষ করা। লেখাপড়া শিখেও যে কোনও মানুষ এতটা স্টুপিড—'

'স্টপ ইট! এবার আপনি লিমিট ক্রস করছেন। আমার বাবাকে মূর্খ বলার অধিকার আপনাকে কেউ দেয় নি। আপনার মতো মেরুদণ্ডহীন বুদ্ধুর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, ওটা বাবার একার ডিসিশন নয়। আত্মীয় স্বজনের ফ্যাক্টর বলে একটা ব্যাপার আছে।'

'আমি বুদ্ধু? স্পাইনলেস? আপনি-আপনি—'

'তাছাড়া কী? আমার বাবাকে মূর্খ বলছেন, আর আপনি সব মেনে নিয়ে চোরের মতো পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। লজ্জা করে না আপনার? আপনি কি কিছু কম? ল্যাজে গাদাগুচ্ছের ডিগ্রি ঝুলছে। আমার বাবা যদি ভুল করে থাকেন, আপনি সেটা সহ্য করে কম অন্যায় করেছেন? দুজনেই সমান অপরাধী।'

'কী কথা! এই না হলে যোগ্য বাবার যোগ্য মেয়ে।'

'আবার বাবা তুলছেন?'

'আপনি বাধ্য করছেন আমায়। কী করার ছিল আমার, অ্যাঁ? লাঠিসোটা নিয়ে আপনাদের বাড়ি চড়াও হব? নাকি আপনাদের সামনে বসে ভেউভেউ করে কাঁদব? আফটার অল, দিস হ্যাপনস টু বি নেগোশিয়েটেড ম্যারেজ। আমি কি প্রেম করেছি পাঁচ বছর ধরে?'

'করেননি? পাঁচ বছর ধরে না হোক, তিনমাস ধরে করেননি? বলুন, বলুন, বুকে হাত দিয়ে বলুন।'

'না...মানে... প্রেম বলতে যেটা বোঝায়...,'

'প্রেম বলতে কী বোঝায় মশাই? দিনের পর দিন একসঙ্গে ঘোরা, ময়দানে চিনেবাদাম ছাড়ানো, সিনেমা হলে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসা, হাত-টাত চেপে ধরা কি অন্ধকারে চকাস করে চুমু খাওয়া...এইটাই কি বলতে চাইছেন?'

'আমি ঠিক...'

'কী ঠিক? সাধে কি আর স্পাইনলেস বলেছি আপনাকে? তিন মাস ধরে অন্তত: ১৮০ ঘন্টা আমরা ফোনে বকবক করেছি। ফেসবুকে রোজ রাত ২ টো পর্যন্ত চ্যাট করেছি। এগুলো কিছু নয়? ভবিষ্যতের প্ল্যান করা, দুজনের ভালো-মন্দ, পছন্দ-অপছন্দ জানা, এসব ফালতু? এর মধ্যে ভালো লাগা, ভালোবাসা কিচ্ছু নেই? বলুন?'

'অ-আপনি তো মহামুশকিলে ফেললেন। নিজেরা যাচ্ছেতাই কারণ দেখিয়ে আমায় বাতিল করলেন, সেই যন্ত্রণায় আমি চারদিন ঘুমোতে পারছি না, ছটফট করছি, এখন আপনি এসে আমাকেই চেপে ধরলেন। সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন।'

'চাপাবই তো। হাজারবার চাপাব। আপনি ছাড়া কার ঘাড়ে চাপাব বলুন? রাস্তার লোকজনের ঘাড়ে? আপনার ঘাড়ে চাপানো এবং নিজে চাপা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই আমার। আই' ম হেল্পলেস বিকজ আই'ভ মেড আপ মাই মাইন্ড অন দ্যাট ডে হোয়েন অ্যাই মেট য়ু ফার্স্ট টাইম। বুঝলেন কিছু?'

শেষদিকে ওই গলাটা ধরে এল।

তার শরীরে হঠাৎ কাঁটা ফুটল। কোনও জবাব বেরোল না।

'কী হল? চুপ করে আছেন? আমায় নির্লজ্জ লাগছে?'

'ওই যে...দেখছেন? টুংফাং রেস্তোরাঁ। অনেকক্ষণ আমরা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বকে যাচ্ছি। সবাই তাকাতে-তাকাতে যাচ্ছে। একটু বসবেন?'

'যাক, বাঁচালেন। আপনি না বললে এটাও বোধহয় আমাকেই বলতে হতো।'

গজদাঁত দুটোয় হাসি ঝিলিক দিল।

স্যুপ অর্ডার করে দুজনে মুখোমুখি।

'দেখুন মশাই, ছোটবেলা থেকে ব্যাপক চাপের মধ্যে বড় হয়েছি। সোস্যাল স্টেটাস, বাবা-মার এডুকেশন আর কনজারভেটিজম। কলেজ-য়ুনিভার্সিটিতে ছেলেরা আওয়াজ দিত 'নাক উঁচু' মেয়ে। আপনি এগুলো জানেন। এটাও জানেন, আমার কন্ডিশন ছিল ফোটো

দেখে সব ফাইন্যাল হলে তবে ছেলের মুখোমুখি হব। একবারই। যদি পছন্দ না হয়, বিয়েই করব না।'

'জানি। আমারও সেম কন্ডিশন ছিল।'

'হ্যাঁ। তারপর দেখাদেখি হল। পছন্দ হল শুধু দেখে নয়, কথা বলে। তারপর...'

'কথা, শুধু কথা। স্বপ্ন, প্ল্যান, হানিমুন। ঠিক হল, আমাদের দ্বিতীয় এবং ফাইন্যাল দেখাটা হবে শুভদৃষ্টির সময়ে।'

'হ্যাঁ, কন্ডিশনটা আমিই দিয়েছিলাম। একেই বলে কপাল, আমাকেই সেটা ভাঙতে হল। প্রাণের দায়ে। আসলে অতিরিক্ত অহংকার বোধহয়—'

'একমিনিট। ফোনে বোধহয় আমরা 'আপনি' করে বলতাম না। তাই না?'

লজ্জায় মুখ নীচু করে ফেলল ও। গালে আভা ফুটল।

'এনা, ওসব কথা থাক। এখন কী করতে চাও, স্ট্রেট বলো তো? আমরা নিজেরা গোপনে রেজিস্ট্রি করে ফেলব?'

'না। বাবা-মাকে যখন জানাব, তাঁরা মনে-মনে কিছুতেই মেনে নেবেন না। ভয়ানক দু:খ পাবেন। আমি একমাত্র মেয়ে হয়ে ওদের কষ্ট দিতে পারব না।'

'তাহলে? তাহলে তো দেখা যাচ্ছে ইটস নেকসট টু ইমপসিবল!'

'আ:! অত ইমপেশেন্ট হচ্ছ কেন? রেগে যেও না প্লিজ, তুমি কিন্তু একটু বোকা আছ। মাইন্ড অ্যাপ্লাই করো, ঠিক সলিউশন বেরুবে।'

'সরি! তুমি হচ্ছে মহা বুদ্ধিমতী মহীয়সী! তুমিই সমাধান করে দাও। আমি বোকা সোকা লোক।'

'বলব বলেই যে তোমায় ধাওয়া করেছি, হে মূর্খ! এই নাও। এটা ব্যাগে ঢোকাও।'

এনা একটা ভাঁজ করা কাগজ এগিয়ে দিল।

'কী এটা?'

'আমার কুষ্ঠির জেরক্স।'

'তোমার কুষ্ঠি! আমি নিয়ে কী করব?'

'খাবে! চিবিয়ে-চিবিয়ে খাবে। উফ, কী হাঁদারাম রে বাবা। এখনও বুঝতে পারছ না! তোমার কুষ্ঠি অলরেডি তোমার বাবাকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। মাথা ঠান্ডা করে শোন। এই কুষ্ঠি আর তোমার কুষ্ঠি নিয়ে একজন জ্যোতিষীর কাছে যাবে। বলবে, আমার কুষ্ঠি দেখে তোমার কুষ্ঠি নতুন করে বানাতে। জন্ম তারিখ-মাস-বছর এক থাকবে। শুধু জন্মসময়টা এমনভাবে একটুখানি পালটাতে হবে, যাতে দুজনের কুষ্ঠি হবে একেবারে 'মেড ফর ইচ আদার'। আমার জ্যোতিষী-জ্যাঠা আর বাগড়া দিতে পারবে না।'

'মাই গড! তুমি তো ডেঞ্জারাস মেয়ে। এটা কি অ্যাটঅল পসিবল?'

'হান্ড্রেড পার্সেন্ট। আমি ডেফিনিট হয়ে এসেছি।'

'কিন্তু-কিন্তু এটা তো একরকম—'

'থামো তো! এভরিথিং ইস ফেয়ার, ইন লাভ অ্যান্ড ওয়র। যাও! কালকের মধ্যে নতুন কুষ্ঠি বানিয়ে ফেলো। নেকসট অ্যাকশন আমি বলে দেব।'

এনা উঠে দাঁড়াতে গেল। সে ওর হাতদুটো চেপে ধরল।

'এটা-এটা কী হচ্ছে? আমাদের কন্ডিশন ব্রেক করছ।

'কন্ডিশন! হা:—! সে তো তুমিই আগে ব্রেক করেছ।'

'উ:! আমার শরীর কাঁপছে! ছাড়ো বলছি।'

'না। আমার ভিতরে কী হচ্ছে, তোমায় বোঝাতে পারব না।'

'বুঝে কাজ নেই।'

অরিন্দমের রবিবার

ভিজে ছাতা ভাঁজ করতে করতে টিকিটের লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল অরিন্দম। বড় ঘড়িতে আটটা দশ। এই রে! মাত্র দু-মিনিট বাকি। বারুইপুর লোক্যাল মিস করলে দেড়ঘণ্টার ধাক্কা।

এই অবস্থার জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী ও নিজে। মা ছটা থেকে ঠেলছেন। কিন্তু রবিবার সকালের ঘুমের মৌজ ছেড়ে ওঠা কষ্ট! তার উপর কাল রাত থেকে নাগাড়ে বৃষ্টি। কখনো জোরে, কখনো টিপটিপ। শনিবারের রাতের মেনু আবার ছিল খিচুড়ি আর বেগুনি। অরিন্দমের খুব প্রিয়। একটু বেশি খাওয়া হয়ে গিয়েছিল।

'একটা সুভাষগ্রাম।'

অরিন্দম দশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিল। আটটা এগারো।

'খুচরো দিন।

'কত?'

'তিন টাকা।'

'এই রে! তাড়াহুড়োয় মানিব্যাগ ঝেড়ে একটা পাঁচটাকার কয়েন আর সিকি-আধুলি নিয়ে দুটাকা বেরোল।

'পাঁচ টাকা আছে। হবে?'

'চেঞ্জ নেই।'

'দিতে হবে না! টিকিট দিন।'

টিকিটটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে ছুটতে শুরু করল অরিন্দম। সবকিছু বিস্বাদ লাগছে। লোকটা ওর গালে চড় মেরে ঠকিয়ে নিল!

গেটের কোণের দিকে কালো কোট এক ঝাঁকা-মুটেকে ধরেছে। রবিবারের বউনি করছে। অরিন্দম তাকে জিগ্যেস করল। সে না তাকিয়ে আঙুল দিয়ে প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে থাকা সবুজ সরীসৃপকে দেখিয়ে দিল।

হুইসল বাজিয়ে দিয়েছে। প্রথমদিকের ৪-৫টা কম্পার্টমেন্ট বাদ দিয়ে অরিন্দম উঠে পড়ল।

প্যাসেজে দাঁড়িয়ে লম্বা লম্বা হাঁফ ছাড়ল অরিন্দম। একটু হলেই ঝাড়া দেড়ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হতো!

ভিতরের দিকে চোখ পড়ল। নিমেষে ওর বুকের মধ্যে জলতরঙ্গের বাজনা বেজে উঠল।

কম্পার্টমেন্টে মাত্র একজনই প্যাসেঞ্জার। বাঁ-দিকের জানালার পাশে বসে আছে। বছর বাইশ-তেইশের যুবতী। ধারালো চোখনাক, ডিমের মতো মুখ, মাজা রং আর হ্যাঁ— সিঁথিতেও চোখ চলে গেছে অরিন্দমের। সাদা।

ট্রেন চলছে। মেয়েটি তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। হাল্কা নীল তাঁতের শাড়ি। কপালে নীল টিপ।

ছি: ছি:! অরিন্দম নিজেই লজ্জা পেয়ে যায়, সে হ্যাংলার মতো তাকিয়ে আছে। মেয়েটির নিশ্চয়ই অস্বস্তি হচ্ছে।

কোথায় বসা যায়? প্যাসেজের উল্টোদিকে গিয়ে বসবে? তাহলে তো দেখা যাবে না।

অনেক ভেবেচিন্তে অরিন্দম ডানদিকের জানালার ধারে গিয়ে বসল। নিজেকে আপ্রাণচেষ্টায় সংযত করে বাইরে চোখ মেলেছে।

পার্ক সার্কাস পার হয়ে বালিগঞ্জ আসছে। সন্তর্পণে চোখের কোণ দিয়ে অরিন্দম দেখে নিল, যুবতী এখনও বাইরের দিকেই তাকিয়ে আছে।

আশ্চর্য! ওর কি একবারও অরিন্দমকে দেখতে ইচ্ছে করছে না? যত ইচ্ছে শুধু পুরুষদের? কিন্তু ওর বন্ধুরা যে বলে, 'বস, তোর সঙ্গে রাস্তায় বেরুব না। সব মেয়ে তোর

দিকে ঝারি করে'!

দেখতে শুনতে অরিন্দম মোটেই ফ্যালনা নয়। ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি হাইট, টানটান চেহারা। শক্ত চিবুক, পুরু ঠোঁট, গভীর চোখ। বিয়েতে রাজি হলে বাড়িতে এতদিনে মেয়ের বাবাদের লাইন পড়ে যেত। অরিন্দমের এতদিন বেশ গর্ব ছিল নিজের চেহারা সম্পর্কে। মেয়েটা সন্ন্যাসী নাকি?

বালিগঞ্জ প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ঢুকছে। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। দু-চারটে লোক ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। হে ঈশ্বর, এই কামরায় যেন কেউ না ওঠে!

ভাবতেই হাসি পেয়ে গেল। এক সম্পূর্ণ অপরিচিত যুবতী, চেনে না, জানে না, তাকে নিয়ে আকাশকুসুম ভেবে চলছে। গল্প-উপন্যাসে বা সিনেমায় যেমন হয়। নায়ক-নায়িকা ফাঁকা ট্রেনে উঠেছে। কামরা ফাঁকা। মাঝপথে ভিলেন উঠে এল। ব্যস, নাটক শুরু। ভিলেন খলখল করে হেসে এক-পা দু-পা এগিয়ে আসবে নায়িকার দিকে। নায়িকা বিপন্নচোখে তাকাবে অচেনা নায়কের দিকে। নায়ক তখন বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে। বেদম পিটুনি দেবে ভিলেনকে। নায়িকা কৃতজ্ঞচোখে তাকাবে। প্রেম জমে উঠবে।

এইজন্যেই ছোটমামা প্রায়ই ওকে খোঁচায়, 'এখনও তোর ম্যাচিওরিটি এল না।' আর মাকে বলে, 'দিদি, এবার ওর বিয়ে দিয়ে দাও। নইলে মানুষ হবে না।'

মা হেসে বলেছে, 'কী করব বল? রাজি হচ্ছে না। আমি দিতে পারলে তো বাঁচি।'

বয়সের তফাত থাকলেও ছোটমামা অরিন্দমের বন্ধুর মতো। ফাজলামি-ইয়ার্কি সব চলে। ছোটমামা আরও একধাপ এগিয়ে বলে, 'রাজি হবে না মানে? ও সব পেটে খিদে, মুখে লাজ। ধরে বেঁধে দিয়ে দাও। সুড়সুড় করে সাত পাক ঘুরে পড়বে। আমার ভাগ্নে, আমি মাল চিনি না?'

অরিন্দম হাসি চেপে বলেছে, 'দয়া করে আমার বিয়ের ব্যাপার নিয়ে অত ভেবো না। পৃথিবীতে অনেক কঠিন সমস্যা আছে। সময় হলেই বিয়ে করব। তোমায় দুশ্চিন্তা করতে হবে না।'

'দুশ্চিন্তা করব না? বলিস কী রে! এরপরে যে হাড়ে পাক ধরবে, চামড়া ঝুলে যাবে।'

মা তখন মামার উস্কানিতে তেতে ওঠেন। সিরিয়াসভাবে বলেন, 'না না খোকন, এবার তুমি বিয়ে কর। আমি আর সংসার ঠেলতে পারছি না! আমার কথাটা অন্তত একবার ভাব।'

অরিন্দমকে চুপ করে যেতে হয়। মায়ের জীবনের সবচেয়ে দামি সময়টা কেটেছে দু:খ-কষ্ট আর লড়াই করে। অরিন্দমের বাবা আর্মিতে ছিলেন। কাশ্মীরে পোস্টেড। যখন ওর পাঁচ বছর বয়েস, একদিন আচমকা খবর এল, বাবা নেই! বর্ডারে গোলাগুলি চলছিল।

সেই থেকে অরিন্দমকে বুকে আগলে বড় করে তুলেছেন মা। কোনদিন কোনও অভাব বুঝতে দেননি।

অরিন্দম মাকে নিরাশ করেনি। ছেলেবেলা থেকে মা ওর একমাত্র বন্ধু। এমন কোনও কথা নেই, যা ও মাকে বলে না। লেখাপড়াতেও স্ট্যান্ডার্ড রেজাল্ট করে এসেছে। পলিটিক্যাল সায়েন্সে গ্র্যাজুয়েশনের পরে জার্নালিজমে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করেছে। বছর পাঁচেক হল ঢুকেছে কলকাতার নামি কাগজে।

এতদিনে হয়ত বিয়ে হয়ে যেত। হয়নি একটাই কারণে। বাড়ি। অরিন্দম বরাবর স্বপ্ন দেখেছে, তাদের একটা ছবির মতো বাড়ি হবে। ছোট বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। সামনে একফালি বাগান।

এবারে সেই স্বপ্ন পূর্ণ হতে চলেছে। অফিস থেকে তিন লাখ লোন স্যাংশন হয়েছে। মায়ের পেনশনের টাকা রেকারিং-এ বেড়ে পাঁচের কাছাকাছি।

তবে সাত-আট লাখে কলকাতায় আজকাল বাড়ি বা ফ্ল্যাট হয়না। বেশ কিছুটা দূরে যেতে হবে। তা হোক। বরানগরের ভাড়াবাড়িতে এখন হাঁফ ধরে যায়। আলো-বাতাস ঢোকে না, স্যাঁতসেঁতে।

জমির খোঁজেই আজ সুভাষগ্রামে যাওয়া। দিন পনেরো আগে অফিসের সহকর্মীর কাছ থেকে খবরটা পেয়েছিল। স্টেশন থেকে মিনিট পনেরোর হাঁটাপথ, সাইকেল রিকশায় ৫-৭ মিনিট। নি:সন্তান বুড়ো-বুড়ি। নিজের বাড়ি বাদে ১০ কাঠা জমি। তার থেকে ৫ কাঠা বেচবেন। ৪০ হাজার করে কাঠা।

মাঝে একদিন অফিস থেকে বেরিয়ে কলিগকে সঙ্গে নিয়ে অরিন্দম জমি দেখে এসেছে। পূর্ব-দক্ষিণ-উত্তর, তিনদিকই খোলা। পছন্দ হয়েছে। মালিক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলেছে। আজ বায়না হবে, সইসাবুদ হবে। আজ শুভদিন।

মা মুখে যাই বলুক, মনে মনে খুব খুশি হয়েছে। ওপার বাংলায় জন্ম, শৈশব কেটেছে খুলনার চন্দনীমহলে। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কথায় কথায় আজও মা ফেলে আসা গ্রামের কথা বলে। ধু-ধু মাঠ, সবুজ গাছগাছালি, দিঘি-খালবিল-নদী...বলে আর দীর্ঘশ্বাস লুকোয়।

সত্যি, অদৃষ্ট কোথা থেকে কোথায় নিয়ে ফেলেছে মাকে!

'শুনছেন?'

একঝটকায় অরিন্দমের ঘোর কেটে গেল।

সহযাত্রিণী ডাকছে।

বাপরে! মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। খোলা জানালা দিয়ে জলের ছাঁট এসে গোটা কম্পার্টমেন্ট জলে সপসপ করছে। ওর জামাপ্যান্ট ভিজে সপসপে। আশ্চর্য! এত আনমনা হয়ে পড়েছিল?

'বলুন।'

'একটু এদিকে আসবেন? কিছুতেই নামাতে পারছি না।'

নিজের দিকের জানালার শাটার নামিয়ে দ্রুত ওদিকে গেল অরিন্দম। ওদিকের শাটারটা অর্ধেক নেমে বেকায়দা আটকে গেছে। দুদিকের স্প্রিং লক চেপে টান দিল নিচে। সুড়ুৎ করে নেমে এল।

'থ্যাঙ্কস।'

'ওয়েলকাম।'

'এদিকেই বসে যান।'

'না-না, ঠিক আছে।'

'ঠিক নেই। ওদিকে বসবেন কী করে? নিজের প্যান্টের অবস্থা দেখেছেন কী হয়েছে? একবার দেখেছেন?...বসুন।'

'হ্যাঁ...মানে...'

মেয়েটি ঠোঁট টিপে হাসল, 'আপনি অদ্ভুত লোক মশাই! এত জোরে বৃষ্টি হচ্ছে, জলে সব ভিজে যাচ্ছে, টের পাচ্ছেন না? বাব্বা!'

অরিন্দম টের পেল ওর কানের লতি গরম হয়ে উঠেছে। সাংঘাতিক মেয়ে! তাকে বারবার হারিয়ে দিচ্ছে। সামনের সিটে বসে সে সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টা করে। কাঁচ দিয়ে দেখতে দেখতে বলে, 'কোথায় এলাম বলুন তো?'

'কোথায় নামবেন?'

'সুভাষগ্রাম।'

'এখনও পাঁচটা স্টেশন। আমিও সুভাষগ্রাম।'

'আপনি ওখানেই থাকেন?'

'না। আমার মাসির বাড়ি। আপনি?'

'আমি একজনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। এর আগে একবার এসেছিলাম। প্রফুল্ল পল্লী। জীবন ঘোষালের বাড়ি।'

'প্রফুল্ল পল্লী আমার যাওয়ার পথেই পড়বে। আপনার রিলেটিভ?'

'না-না। ওনার জমির অর্ধেক কিনব।'

'তাই? কলকাতায় ভাড়া বাড়ি?'

'হ্যাঁ। ঠিক কলকাতায় নয়, বলতে গেলে উত্তর চব্বিশ পরগনায়। বরানগরে। মা আর ছেলের সংসার।'

'আর কেউ নেই?'

'না:। খুব ছোটবেলায় বাবা চলে গেছেন। আর্মিতে ছিলেন। মা আমায় মানুষ করেছেন। মামাবাড়ি ছাড়া কারও সঙ্গে যোগাযোগ নেই। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কেন।'

'আপনার মা ঠিকই করেছেন।'

'আপনারা?'

'আমার ছোট একটাই বোন। পড়ছে। আমাদেরও বাবা নেই। শুধু মা। আপনারা দুজন, আমরা তিনজন।'

দুজনেই একটু হাসল। অরিন্দম বলল, 'কোথায় থাকেন?'

'শিয়ালদার কাছেই। ছক্কু খানসামা লেন।'

কথা চলছে। ওর নাম সুতপা। বছর দুয়েক হল, বি.এ. পাশ করেছে। টিউশনি করে প্রাইভেট ফার্মে ছোট চাকরি করে। মা শায়া-ব্লাউজ সেলাই করেন। টেনেটুনে সংসার চলে। মাসখানেক ধরে মায়ের পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে। এক্সরে করে টিউমার ধরা পড়েছে। ডাক্তার বলেছেন, অপারেশন করতে হবে। ২০-২৫ হাজার টাকা লাগবে। সেজন্যেই সুতপা মাসির কাছে যাচ্ছে। মাসিরা বড়লোক, যদি কিছু সাহায্য করে।

শুনতে শুনতে অরিন্দম ভিজে গেল।

'উঠুন। সুভাষগ্রাম আসছে।'

এখনও তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। ছাতা খুলে দুজনে নামল। একটি ঝাঁকড়া অশত্থগাছের নিচে দাঁড়াল। অরিন্দম একটু ইতস্তত করে বলল, 'একটা কথা বলব?'

'কী?'

'এক রিকশায় যেতে আপনার আপত্তি আছে কি? মানে এদিকটা আমি ঠিক...আমায় নামিয়ে দিয়ে আপনাকে পৌঁছে...'

'না, না। চলুন।'

রিকশা চলতে শুরু করেছে। অরিন্দম রিকশাওয়ালাকে বলে, 'ভাই, প্রফুল্ল পল্লীর জীবন ঘোষালের বাড়ি চেন? ওখানেই যাব। আমাকে নামিয়ে তুমি এই দিদিমণিকে পৌঁছে দেবে। আরেকটু সামনে। তারপর ফিরে আসবে জীবনবাবুর বাড়ি। তোমার রিকশাতেই স্টেশন ফিরব।

'কতক্ষণ লাগবে বাবু?'

'বেশি নয়। আমার ঘণ্টাখানেকের কাজ।'

'ঠিক আছে বাবু।'

এই মুহূর্তে দুজন যাত্রী চুপ। কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছে না। একটু পরে অরিন্দম বলল, 'এখানে আমার বাড়ি হয়ে গেলে মাঝেমধ্যে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। যখন আপনি মাসির বাড়ি আসবেন।'

সুতপা সামান্য হাসল। বলল, 'প্রায় দু-বছর পরে আসছি। মা চায় না, পয়সাওলা আত্মীয়ের বাড়ি বেশি আসা-যাওয়া করি। যদি হ্যাংলা ভাবে। ভাবে, কোনও সাহায্যের আশায় আসছি। কিন্তু—'

অরিন্দম জিজ্ঞাসুচোখে তাকাল। সুতপা বলল, 'সেই হাত পাততেই আসতে হল। মা জানে না।...নেমে পড়ুন।'

অরিন্দম নেমে দাঁড়ায়। হাত নেড়ে আস্তে আস্তে বলল, 'আবার হয়তো দেখা যাবে।'

'হয়তো।'

রিকশা এগিয়ে গেল।

জীবন ঘোষাল এগ্রিমেন্টের কাগজপত্র সব গুছিয়ে রেখেছিলেন। অরিন্দমের সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'একবার চোখ বুলিয়ে নিন।'

'কী দেখব? আমি দলিলপত্র কিছু বুঝি না। কোথায় সই করতে হবে বলুন।'

'উঁহু। না দেখে সই করা তো চলবে না ব্রাদার! ঠকে যাবে।'

'যাব তো যাব। ঠকব না জেনেই আপনার কাছে এসেছি।'

জীবনবাবু হেসে উঠলেন। জীবনবাবুর স্ত্রী মিষ্টির প্লেট আর চায়ের কাপ নিয়ে ঢুকলেন।

'এ কী বউদি? এসব কেন?

'শুভকাজে মিষ্টিমুখ করতে হয়। এসব আমাদের সংস্কার।'

অরিন্দমের নিজের ওপর খুব রাগ হচ্ছে। ইস! সে নিজে বোকার মতো খালিহাতে এসেছে।

এখন কিছু করার নেই। আগে বরং টাকাটা দিয়ে দেওয়া যাক। অরিন্দম ব্যাগের চেন টানল।

'কী হল ব্রাদার, টাকাকড়ি কি পালিয়ে যাচ্ছে নাকি? চা জুড়িয়ে যাবে যে।'

ততক্ষণে অরিন্দম কুলকুল করে ঘামতে শুরু করেছে। মাথা ঝিমঝিম করছে, শরীর অবশ লাগছে। ওর হাতব্যাগের মধ্যে প্রাণপণে খুঁজে চলেছে নোটের বান্ডিলটা। কোথাও নেই।

জীবনবাবু লক্ষ করেছেন অরিন্দমকে। অভিজ্ঞ মানুষ। বললেন, 'কী হল ব্রাদার?'

মাথা নাড়লে অরিন্দম। অস্ফুট বলল, 'পাচ্ছি না।'

'টাকা?'

হতবুদ্ধির মতো মাথা উপরনিচ করে অরিন্দম।

'যাবে কোথায়? একশো টাকার নোট?'

'না। পাঁচশো টাকার। পঞ্চাশটা।'

'ভালো করে দেখেছেন? কোথাও ঢুকে নেই তো?'

'না:! এইটুকুন ব্যাগ।'

'ভালো করে মনে করে দেখুন তো, ঠিক এনেছিলেন? নাকি তাড়াহুড়োয় বাড়িতেই ফেলে এসেছেন?'

'উঁহু। মায়ের কাছে ছিল। মা বেরোবার আগে ব্যাগে ভরে দিয়েছে।'

'তাহলে যাবে কোথায়? ট্রেনে কি ভিড় ছিল?'

'না। একদম ফাঁকা।'

'স্টেশন থেকে রিক্সায় এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'অদ্ভুত কাণ্ড তো মশাই। টাকাগুলো কি পাখা মেলে উড়ে গেল নাকি? ব্যাগের চেন ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ। এই তো। পুরো আটকে যাচ্ছে।'

'অরিন্দমবাবু, আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিওর, টাকা আপনি ভুল করে বাড়িতে ফেলে এসেছেন। ছাড়ুন! এখন চা খান, মিষ্টি খান। আজ শুভদিন, এই বায়নায় সই করুন।

'কিন্তু টাকা ছাড়া—'

'ব্রাদার, আমার বয়েস ষাট পেরিয়েছে। জীবনে অনেক লোক চরিয়েছি। আপনি আমায় একটাকার একটা কয়েন দিন। টাকা কালপরশু যখন হোক, দিয়ে যাবেন।'

অরিন্দমের চোখ ঝাপসা হয়ে এল।

একচুমুকে চা শেষ করে, মুখে একটা মিষ্টি দিয়ে অরিন্দম উঠে পড়ল।

'আরে ব্রাদার, বসুন, বসুন। আপনি ইয়াংম্যান, এত অল্পে ভেঙে পড়লে চলবে?'

'না। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে ভালো করে খুঁজব।'

বলছে বটে, কিন্তু মন বলছে অন্য। ব্যাগেই টাকা ছিল। শিয়ালদায় ঢোকার সময়েও বান্ডিলটা দেখেছে। চেন ফাঁক করে। নিজের চোখ তো ভুল করতে পারে না।

'ঠিক আছে। এটা রাখুন।' জীবন ঘোষাল এগ্রিমেন্টের কপি ধরিয়ে দিলেন।

বাগানের গ্রিল গেটে হাত রেখে অরিন্দম দেখল, তাদের সাইকেল রিকশা ফিরে আসছে। অরিন্দম এগিয়ে গেল।

রিকশা থামিয়ে চালক ছেলেটি ওর দিকেই এগিয়ে আসছে। ওর হাতে একটা পলিথিনের ভাঁজ করা প্যাকেট। রাবার ব্যান্ড জড়ানো। ছেলেটা ওর হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'এটা রাখুন বাবু।'

'কী আছে?'

'জানি না বাবু। ওই দিদিমণি দিলেন। বললেন, বাবুর জিনিস। পড়ে গেছিল।'

দম আটকে পলিপ্যাকের ভাঁজ খুলল অরিন্দম। সঙ্গে সঙ্গে 'গান্ধীর ছবি'। ৫০০ টাকার নোটের বান্ডিল।

একটানে বের করে চেঁচিয়ে উঠল অরিন্দম, 'পেয়ে গেছি দাদা! পেয়ে গেছি। রিকশায় পড়ে গেছিল।'

'বলিনি আপনাকে? বলুন?' জীবনবাবু বেরিয়ে এসে ওর হাত চেপে ধরলেন, 'শুধুশুধু টেনশন করছিলেন। আরে বাবা, কথায় বলে উৎপাতের কড়ি চিৎপাতে যায়। আপনার কষ্টের টাকা, এভাবে চোট হয়ে যাবে? দুগ্গা, দুগ্গা!'

অরিন্দমের মন এখন শরতের হাওয়া। ফুরফুর করছে। রিকশায় এলিয়ে বসেছে। এই ছেলেটাকে ভালো বকশিশ দিতে হবে। ও না জেনে যা করেছে, তুলনা নেই।

পলিথিনের খালি প্যাকেটটা সিটের পাশে পড়েছিল। ফেলে দিতে যাচ্ছে, কী মনে হতে ভিতরে দেখল। একখানা ভাঁজ করা কাগজ। সুতপার চিঠি?

রিকশা সাঁ-সাঁ করে ছুটছে। এখন বৃষ্টি নেই। জোলো বাতাস বইছে। গাছপালায় সোঁদা গন্ধ।

চিঠি পড়া কখন শেষ হয়ে গেছে অরিন্দমের। ছোট্ট কয়েকটা লাইন। ডায়েরির ছেড়া কাঁগজে গোটা গোটা হরফে তাড়াহুড়োয় লেখা। ডায়েরির পাতা ছিঁড়ে।

কাগজখানা হাতেই ধরা আছে। অরিন্দম বাহ্যজ্ঞানহীন বসে আছে।

সম্বোধনহীন চিঠি।

'মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করে ফেরত পাঠালাম। মায়ের অপারেশন এই টাকাতে হয়ে যেত। কিন্তু তারপরেই আপনার মুখ আর আপনার মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। পারলাম না।

আমার মা আজও জানে না আমার পেশা। মা অসুস্থ হয়ে পড়ার পর এই র্যা কেটে নাম লিখিয়েছি।

আমার অনুরোধ, আজকের সকাল ভুলে যাবেন। ভালো করে বাড়ি করুন। আর কোনওদিন যেন দেখা না হয়।'

চিঠিটা কখন বুকপকেটে ঢুকিয়েছে, কখন ফিরতি ট্রেনের টিকিট কেটে ট্রেনে চড়ে বসেছে, কিছুই মনে নেই অরিন্দমের।

সংবিত ফিরল শিয়ালদায় নেমে। বুকের মধ্যে প্রবল ভাঙচুর হচ্ছে।

প্ল্যাটফর্মের পাশে চায়ের স্টল। এককাপ চা অর্ডার দিল। বিড়ি-সিগারেটের নেশা নেই অরিন্দমের, তাও একটা কিনে ধরাল। হুসহুস করে ধোঁয়া গিলছে। চোখ জ্বালা করছে। করুক।

এই সময় একটা হইচই ভেসে এল। একটু দূরে কিছু মানুষের জটলা। কর্কশ কণ্ঠ উড়ে-উড়ে আসছে।

'হ্যাঁ মশাই, এই মেয়েছেলেটা?...অ্যাই, একদম নড়বে না!... দাঁড়াও।'

'আরে মশাই, বলচি তো চিনে রেখেচি। এমন মধুমাখা থোবড়, সহজে ভোলা যায়? তাপ্পর কড়কড়ে তিনশো টাকার ধাক্কা।...পাশে বসতে চাইল। দিলুম বসতে।'

পাশ থেকে একজন ফুট কাটল, 'দেবেনই। বুড়ো বয়েসে রস তো কমেনি। ডবকা মাল, ঘষাঘষি হলেও আরাম।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিয়েছি। বেশি সাধু সাজবেন না তো! আপনি দিতেন না?...বাসে উঠে দেখি, পকেট ফাঁক।'

'দেখে কিন্তু ভদ্রঘরের মনে হয়।'

'ওটাই তো ওর ক্যাপিটাল। চেহারা ভাঙিয়ে লোকের সব্বোনাশ করে যাচ্ছে।'

'দিন না পুলিশের হাতে। এক রাত হাজত বাস করুক, ছিবড়ে করে ছেড়ে দেবে।'

'আরে সে তো দেবই। তার আগে, ওর ব্যাগট্যাগ থেকে—অ্যাই মেয়েটা...'

সিগারেটে টান দিতে দিতে অরিন্দম এগিয়ে গেছে। ভিড়ের মধ্যে উঁকি দিয়ে আবার পাথর!

'সুতপা!'

নানান বয়েসি পুরুষ ওকে ঘিরে রয়েছে। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে সে।

কয়েক মুহূর্ত। আবার অরিন্দমের মস্তিষ্কের কোষ কাজ শুরু করেছে। ভিড় ঠেলে ও সোজা এগিয়ে গেল।

'এখানে এসব কী হচ্ছে? অ্যাই সুতপা! তুমি এখানে কী করছ? আমি তোমায় খুঁজে মরছি।...চলে এস।'

'মানে? আপনি কোত্থেকে? জানেন, এই—'

চুপ! একদম ফালতু বকবেন না। কী করছেন জানেন? এতজন মিলে একজন ভদ্রমহিলাকে—'

'ভ-দ্দ-র- মহিলা! আপনি কে মশাই? ওর দলের লোক?'

'তাই মনে হচ্ছে? আপনাদের সাহস তো কম নয়। এবার সোজা মলেস্টির কমপ্লেন করব।'

'মলেস্টি! কে হে আপনি হরিদাস পাল? ওর সাগরেদ? অ্যাই, এটাকেও ধর তো।'

'বটে! দাঁড়ান।' অরিন্দম বুকপকেট থেকে ওর প্রেস কার্ড বের করল, 'একমিনিট। আমিই পুলিশ ডাকছি।'

সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিক। ভিড় পাতলা হতে শুরু করল। যে চুলহীন মধ্যবয়েসি চেঁচাচ্ছিল, সে তবু হাল ছাড়ছে না!

'আমার ভুল হতেই পারে না! এই মুখ, চোখ...হ্যাঁ, এই মেয়েছেলেটাই—

'শাট আপ।' অরিন্দম দাবড়ে উঠল, 'ওর সম্পর্কে আর একটাও খারাপ শব্দ উচ্চারণ করেছেন কি, এখনই জি. আর. পি.কে ডাকব।...সরে যান। আমাদের যেতে দিন।'

পাশ থেকে একজন বলে উঠল, 'কিছু মনে করবেন না দাদা, এই মেয়ে...ইয়ে...মহিলাকে কতদিন চেনেন?'

অরিন্দম ভ্রু কুঁচকে তাকাল, 'চিনি? কতদিন?...হা:। এই অঘ্রাণে আমাদের—বুঝলেন! চলো সুতপা।'

সাউথ সেকশন দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে দুজনে বেরিয়ে এল। সুতপা ঘাড় গুঁজে, একবারও মুখ তোলেনি।

ফ্লাইওভারের কাছে এসে অরিন্দম দাঁড়িয়ে পড়েছে।

'কী হল? মুখ তুলুন।'

জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে সুতপা। তারপর বন্ধ-গলায় বলল, 'এটা...কী হল? আপনি —'

অরিন্দম হেসে বলল, 'কিছুই হয়নি। এখন মাত্র সাড়ে এগারোটা। চলুন, তৃপ্তিতে বসে একটু চা খাই।'

ঝড়ের পরে

সারারাত একফোঁটা ঘুমোতে পারেনি। অসহ্য রাগ-দু:খ- হতাশা বারবার ঝড়ের মতো এসে ছিন্নভিন্ন করেছে। এই আট বছরে ছেলেটাকে চিনতে পারল না? জীবনের এতবড় ভুলটা করে বসল?

খামখেয়ালি, একটু পাগলাটে বরাবরই। যেটা ধরে, সেটাতে ডুবে যায়। সেটা ওর ক্ষেত্রেও সত্যি। ইলেভেনে পড়ার সময় কোচিং ক্লাসে আলাপ। বন্ধুত্ব। ভালো লাগা চড়চড় করে বাড়ছে। অরিত্র ওকে আঁকড়ে ধরল। ওকে ছাড়া ওর চলবে না!

ওরও তো তখন এক অবস্থা। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে অরিত্র দুর্গাপুর গেল। রোজ রাতে ফোন। ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা বকবক। প্রতি সপ্তাহে শনিবার বাড়ি চলে আসা। রবিবার সকালে সটান ওদের বাড়ি।

বাবা-মা দুজনেই সব জানতেন। বাবা সোজাসুজি মজা করতেন অরিত্রর সঙ্গে, 'এই পাগলিকে নিয়ে পারবে তো? ভীষণ অবুঝ, একরোখা। আর...আর একটু ন্যালাখ্যাপাও আছে।'

অরিত্র সটান জবাব দিত, 'আরে কাকু! আমিও তো পাগলা। পাগলা ছাড়া পাগলি চলবে কী করে।'

মা বরং বলেছেন, 'দ্যাখ মামন, তোরা ঠিকঠাক কথা বলে নিয়েছিস তো?'

ও সটান জবাব দিয়েছে, 'তোমাদের দুজনের ক্যারেকটার তো নর্থ পোল, সাউথ পোল। তাও তো এতবচ্ছর টিঁকে গেলে। ব্যাপারটা অবশ্য বেশ বোরিং। সারাক্ষণ দুজনকে নিজের ইচ্ছের উলটোদিকে হাঁটতে হয়। তেমন হলে ওকে পষ্টাপষ্টি বলে দেব। কী বলো?'

'যত্ত বাজে কথা! বাইশ বছর বয়েস হল। না তোর, না অরিত্রর ম্যাচুওরিটি এল। সর্বক্ষণ ম্যা-ম্যা করছে! অবশ্য ওদের ফ্যামিলিটা বেশ ভালো। শিক্ষিত, কালচারড। সেটাই ভরসা।'

অরিত্রদের ফ্যামিলি সত্যিই ভালো। বাবা-কাকার জয়েন্ট ফ্যামিলি। ওরা দুই ভাই। কাকুর ছেলেও পিঠোপিঠি। তিন ভাইয়ে দারুণ ভাব। কাকিমা বেশ মজাদার মহিলা। এই বয়েসেও বাড়িতে দিব্যি বারমুডা-টপ পরে ঘুরে বেড়ান। কাকু সিনেমার লোক। মাসের অর্ধেকদিন বাইরে। বাবা ফিজিক্সের নামি অধ্যাপক। সারাদিন পড়া আর পড়ানো। পুরো ফ্যামিলিটা একাহাতে সামলান অরিত্রর মা। হাসিমুখে। মা-কাকিমার রিলেশন এত ভালো, মনে হয় দুই বোন।

এই ফ্যামিলির ছেলে হয়ে অরিত্র এত নীচে নামতে পারল? না:, অরিত্রর মাথাটাই গেছে। নইলে কী করে বলে, কেন, রবি তো আছে? ছি:-ছি:-ছি:!

এই দিল্লি আসাটাই ওর কাল হয়েছে। তবে সেখানেও তো অরিত্রকে দোষ দেওয়া যাবে না। আসতে চায়নি। ও-ই ঠেলেঠুলে পাঠিয়েছে। সল্টলেকের ছোট কম্পানিতে কাজ করছিল। এরা অনেক বেটার অফার দিল। অরিত্র রাজি নয়। বাড়ি ছেড়ে, কলকাতা ছেড়ে আসবে না।

ও বোঝাল, 'আরে, দু-তিন মাসের তো ব্যাপার! তুই জয়েন কর। এক-দু মাসের মধ্যে আমরা বিয়ে করে ফেলব। শুধু দুজনে থাকব আলাদা ফ্ল্যাটে। রোজ হানিমুন। কী মজা হবে বল তো?'

হানিমুন! হানিমুনই বটে!

অরিত্র বাধ্য ছেলের মতো চলে এল। অফিসের কাছে নয়ডাতে ফ্ল্যাট নিল। তারপরে চটপট ওদের বিয়েটাও হয়ে গেল।

প্রথম দু-দিনটে মাস কী দারুণ কেটেছে। ও উন্মুখ হয়ে থাকত, কতক্ষণে অরিত্র ফিরবে!

তারপর...?

কীসের নেশায় যে অরিত্র এত মেতে উঠল! কাজ না টাকা? কম্পানিতে চড়চড়িয়ে ওপরে উঠতে লাগল। কাজের সময় বাড়তে-বাড়তে বারো ঘণ্টা। বাড়িতে ঢোকে ভুরু কুঁচকে। চান করে চা খেতে-খেতে কম্পিউটারের সামনে ফের বসে পড়ে।

মানুষ, না রোবট?

মুঠোয় ধরা ছোট্ট ফোনটা ভাইব্রেট করছে। স্ক্রিনে কলকাতার নাম্বার। অরিত্রর বাড়ির।

ও চলমান ট্রলি থামিয়ে ফোন টিপল।

—হ্যালো।

—অহনা, আমি আন্টি বলছি।

—বলো।

—তুই কোথায় রে?

—কেন, দিল্লিতে।

—দিল্লিতে? কোথায়?

উফ! মিথ্যে কথা বলা ছাড়া উপায় নেই। নইলে ফোনের মধ্যে—

—কেন, দিল্লির ফ্ল্যাটে।

—ফ্ল্যাটে? তোদের নয়ডার ফ্ল্যাটে?

—হ্যাঁ-অ্যা।

—অহনা, তু-তুই ঠিক বলছিস? বাবুন কোথায়?

—ও তো অফিসে বেরিয়ে গেছে সেই সকালে। কেন, ওকে পাচ্ছ না?

—না:! ফোন সুইচ অফ। অহনা, অহনা, তুই বাজে কথা বলছিস! সুমিতা যে বলল—

মা এরমধ্যেই বলে দিয়েছে আন্টিকে? কী বলল? ও তো মাকে বলেছে, জরুরি কাজে কলকাতায় যাচ্ছে।

—মা কী বলেছে জানি না! বিশ্বাস না করলে কোরো না। কান্ট হেলপ।

বলতে-বলতে ফোনটা কুট করে কেটে দিয়েছে। এয়ারপোর্টের লাউঞ্জের মুখে এসে পড়েছে। ঘনঘন এত ফ্লাইটের অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে, ফোনে ধরা পড়ে যাবে।

অরিত্রর বাড়ির ওপর ওর একটুও রাগ নেই। কাবেরী আন্টিকে অসম্ভব পছন্দ করে। আন্টি ওকে এত ভালোবাসে! ও যখনই গেছে, সময়ে-অসময়ে, কিছু একটা চটপট বানিয়ে মুখের সামনে ধরেছেন, 'দ্যাখ তো, কেমন হয়েছে।'

আবার সেলফোন কাঁপতে শুরু করেছে। যা ভেবেছে, তাই। আবার আন্টি। না, আর ধরা যাবে না। বারবার মিথ্যে বলতে পারবে না। ধরবেই বা কেন?

কষ্ট হচ্ছে, ভীষণ কষ্ট হচ্ছে বুকের ভিতর। আন্টি যে খুব ভালো।

লাগেজ চেক-ইনে দিয়ে বোর্ডিং পাস নিয়ে নিল অহনা। উইন্ডো সিট পেতে গিয়ে একটু পেছনদিকে হল। সাতাশ এফ। হোক। তবু তো জানলার ধারে।

ইন্দিরা গান্ধী এয়ারপোর্ট প্যাসেঞ্জারে থিকথিক করছে। খুঁজে-খুঁজে এককোণে একটা কাউচ পাওয়া গেল।

হলের শেষপ্রান্তে জায়ান্ট স্ক্রিন টিভি চলছে। নিউজ চ্যানেল। সারা ভারতে কোন-কোন নেতা কী-কী কেচ্ছা করেছেন, কোথায়-কোথায় বিস্ফোরণ, বনধ, দুর্ঘটনা, দাঙ্গা হয়েছে, তার ফিরিস্তি। ডিসগাস্টিং!

ও অবশ্য কিছুই দেখছে না।

অরিত্র কী করে উচ্চারণ করল 'রবি'র কথা? তার মানে ওর মনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল! তার মানে অহনাকে সন্দেহ করে।

অসহ্য! একটা বাচ্চা জাঠ ছেলে। কম্প্যুটার সায়েন্স নিয়ে জে.এন.ইউ.-তে পড়ছে। পাশের ফ্ল্যাটে থাকে। অরিত্রর কাছেই প্রথম এসেছিল সফটওয়্যার প্রোগ্রামিং নিয়ে। সেই থেকে ওদের দুজনের সঙ্গে আলাপ। রবির বাবা-মা দুজনেই চাকরিতে বেরিয়ে যায়। ছেলে কলেজ থেকে ফিরে মাঝে-মাঝে আড্ডা দিতে আসে এই ফ্ল্যাটে। ভাবীর কাছে। 'ভাবী' হয়ে গেছে ওর ফ্রেন্ড-ফিলোজফার-গাইড। কলেজের গল্প, বন্ধু-বান্ধবীদের গল্প। নাগাড়ে বকবক করে যায়।

ওর একটি মেয়েকে পছন্দ। ওর ধারণা, মেয়েটিরও ওকে পছন্দ। কিন্তু কীভাবে কথাটা বলবে, ভেবে পাচ্ছে না। মোবাইলে কি এসএমএস করবে? নাকি সরাসরি বলবে? অন্য আরেক গার্লফ্রেন্ড আবার ওকে ইনডাইরেকটলি ইনডিকেশন দিয়েছে। কোন দিকে ঝুঁকবে?

অহনা ধৈর্য ধরে শোনে, পরামর্শ দেয়। আবার মজাও করে। পেছনে লাগে। রবির সঙ্গে বিকেলের ওই সময়টুকু থেমে থাকা সময়ে একঝলক টাটকা বাতাস। দিদি-ভাইয়ের

সম্পর্ক। আড্ডা দিতে-দিতে অহনার কলেজ লাইফ মনে পড়ে যায়। অহনা রোজ ওই সময়টুকু রবির জন্যে ওয়েট করে।

সেই বাচ্চা ছেলেটাকে নিয়ে বলল অরিত্র? বলতে পারল? এত নীচু মন অরিত্রর? এতদিন মিশেও চিনতে পারল না?

ঘোষণা হচ্ছে, 'প্যাসেঞ্জার্স ফ্লাইং অন নাইন ডব্লিউ সিক্স জিরো ফোর টু কলকাতা প্লিজ প্রসিড ফর সিকিওরিটি চেক।'

যন্ত্রের মতো লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছে অহনা। হ্যান্ডব্যাগে ফোন ঢুকিয়ে স্ক্যানারের কনভেয়ার বেল্টে শুইয়ে দিল।

ওপারে গিয়ে আবার বসার জায়গা খুঁজে পেতে প্রবল ঝামেলা! সিটের তুলনায় যাত্রী বেশি।

ঘড়ির দিকে তাকাল। পাঁচটা দশ। সিডিউলড ডিপারচার পাঁচটা কুড়ি। নির্ঘাত লেট করবে। তার মানে কলকাতায় নামতে-নামতে আটটা বেজে যাবে। প্রিপেড ট্যাক্সি পাবে তো? নাকি মাকে একবার ফোন করবে? বাবা যদি অফিসের গাড়িটা পাঠিয়ে দিতে পারে, তাহলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। সঙ্গে দু-দুটো ঢাউস ট্রলি-ব্যাগ আছে।

হ্যাঁ। দিল্লি থেকে ওর যা-যা নিজের, প্রায় সবই নিয়ে চলে এসেছে অহনা।

মায়ের সেলফোনের নাম্বার টিপল অহনা। মা আন্টিকে কেন বলল, সেটাও জিগ্যেস করতে হবে। সব মায়েরাই কি একরকম, একটুও চেপে রাখতে পারে না!

—হ্যালো, মামন? কিরে, শুনতে পারছিস না? ফোন করলি কেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। শোন, আমার পৌঁছতে-পৌঁছতে আটটা বেজে যাবে।

—জানি।

একটা ধাক্কা খেল অহনা। মা জানে?

—বলছিলাম, বাবার গাড়িটা কি পাঠানো যাবে?

—সে ব্যবস্থা বাবা করে রেখেছে। রতন পৌঁছে যাবে। জেটের ফ্লাইট তো?

আবার ঝটকা!

—হ্যাঁ, মানে, তুমি—

—দ্যাখ মামন, তোরা তো মা-বাবা হোসনি, তাই সবটা বুঝবি না।

—কী বুঝব না?

—বাবা-মার কষ্ট। বাবা-মা গেঁয়ো বোকা হলে অবশ্য সমস্যা নেই। যা খুশি বুঝিয়ে দেওয়া যায়। তোদের মুশকিল হচ্ছে, তোদের বাবা-মা কেউই খুব একটা বোকা নয়। দুজনেরই পেটে একটু-আধটু বিদ্যে আছে।

—মা, তুমি কী বলতে চাইছ? তুমি আন্টিকে বলতে গেলে কেন, আমি কলকাতায় আসছি?

—কেন, তাতে দোষটা কী হয়েছে? তুমি আমাদের যেমন মেয়ে, তারও মেয়ে। সে তোমাকে ততটাই ভালোবাসে। আর শোন, যেটা তুমি গোপন করতে চাইছ, গোপন নেই। গোপন থাকে না।

তবু শেষ চেষ্টা করল।

—মা, তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমায় আমি বললাম তো, জরুরি কাজে দু-দিনের জন্যে কলকাতা আসছি।

—হ্যাঁ, সেইজন্যেই তোমায় অত লাগেজ নিতে হয়েছে! দ্যাখ মামন, তোকে কতবার বলেছি, একটা মিথ্যে চাপা দিতে হলে পরপর মিথ্যে বলে যেতে হয়।

এবার বিস্ফোরণ ঘটল!

—আমি মিথ্যেবাদী? সব দোষ আমার?

—তাতো বলিনি। মামন, তুই বাড়ি আসছিস। আমরা যে কতটা নিশ্চিন্ত হব, তোকে বোঝাতে পারব না। আজ রাতে আমরা মা-মেয়ে ঝগড়া করব। কেমন? কীরে, শুনতে পাচ্ছিস?

—উঁ।...

—লক্ষ্মীসোনা। রাগ করে না, কেমন?...

আবার অ্যানাউন্সমেন্ট, 'বোর্ডিং গেট নাম্বার টু'।

মা সব গোলমাল করে দিল। ও কিছুই বলেনি। অথচ মায়ের কথা শুনে মনে হল, সব জেনে গেছে!

উইন্ডো দিয়ে রানওয়ে দেখা যাচ্ছে। মালপত্র উঠছে প্লেনের পেটে। বিকেলের পড়ন্ত রোদ। দূরে টার্মিনাল বিল্ডিং। সারি-সারি নানারঙের যন্ত্রপাখিরা দাঁড়িয়ে আছে। যাত্রী ওঠা-

নামা চলছে। এই সময় দিল্লিতে সাড়ে ছ'টাতেও আলো থাকে।

ফোনটা আবার বাজছে। বাবা। ধরবে? এখনও তো দরজা বন্ধ হয়নি।

—হ্যাঁ পাপা।

—মা তোকে বলেছে, রতন পৌঁছে যাবে? ওকে এক্সিট গেটের কাছে দাঁড়াতে বলেছি।

—ঠিক আছে পাপা। মা বলেছে।

—ফাইন! ডোন্ট ওরি। উইশ য়ু হ্যাপি জার্নি।

—থ্যাঙ্ক য়ু পাপা।

—বাই।...

'প্যাসেঞ্জার্স আর রিকোয়েস্টেড টু সুইচ অফ দেয়ার মোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স গ্যাজেট।'

প্লেন গুড়গুড় করে হাঁটতে শুরু করেছে।

আচ্ছা, ও কি সেক্স-ম্যানিয়াক হয়ে পড়েছে? শরীরে খুব খিদে? নাহ, কই তেমন তো কিছু বোঝে না। বরং প্রথম কয়েকমাস অরিত্র এমন করত, মাঝে-মাঝে বেশ ক্লান্ত লাগত। সারাদিন ঘুম পেত। বিশেষ করে, মাঝরাত্তিরে ঘুম ভাঙিয়ে যখন শরীরে হাতড়ানো শুরু করত। প্রথমটা মোটেও ইচ্ছে করত না। চোখের দু-পাতায় জমাট ঘুম। তবে একটু পরে শরীর ঠিকই সাড়া দিত।

এখন ঠিক উলটো। সপ্তাহের-পর-সপ্তাহ কেটে যাচ্ছে। অরিত্র আসছে, কম্পিউটারে ডুবে যাচ্ছে। ডিনার করছে, ঘুমিয়ে পড়ছে। কোনও ইচ্ছেই নেই। এমনকী উইক-এন্ডগুলোও বাড়িতে বন্দি।

মাসখানেকের মধ্যে ওদের কোনও সংযোগই হয়নি। ওর কি ইচ্ছে হওয়াটা অন্যায়? দু-একবার ভেবেছে, বিছানায় অরিত্রকে নাড়াচাড়া করবে। হাত বাড়াতে গিয়েও থমকে গেছে। অরিত্র যখন নি:সাড়ে ঘুমোয়, ওর মুখখানা দেখে এমন মমতা হয়! সারাটা দিন বেচারি এত চাপ নেয়! ওর ঘুম ভাঙাতে ইচ্ছে করে না।

কাল শুক্রবার ছিল! উইক-এন্ড। বিকেল থেকে ধুলোর ঝড় উঠল। দিল্লির 'আঁধি'। দশ মিনিটের মধ্যে আকাশ ঘন মেঘে ছেয়ে গেল। শুরু হল তুমুল বৃষ্টি।

—ম্যাম, কোক, অর ফ্রেশ লাইম?

ছিপছিপে স্কার্ট পরিহিতা এয়ার-হোস্টেস।

হাত বাড়িয়ে গ্লাস তুলে নিল অহনা। প্লেন এখন আকাশে। উঠছে, আরও উঠছে।

এই মরশুমের প্রথম বৃষ্টি। অহনার মনের মধ্যে বড় পুলক জাগে! ছুটে বেরিয়ে এল ব্যালকনিতে। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে বৃষ্টির বড়-বড় ফোঁটাগুলো ভিজিয়ে দিচ্ছিল ওর চোখমুখ। ওর মনে পড়ে যাচ্ছিল কলকাতার বাড়ি। ছুটে ছাদে চলে যেত।

এখানে প্রচুর গাছ। সবুজে-সবুজ গোটা কমপ্লেক্স। তারাও মাথা নাড়াচ্ছে, প্রাণভরে চান করছে।

দৌড়তে-দৌড়তে কেউ কমপ্লেক্সে ঢুকছে। রবি। ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে।

অহনা যেন একনিমেষে বালিকা হয়ে গেছে। ওপর থেকে চেঁচিয়ে উঠল,—হ্যালো! রবি!

রবি নীচে থেকে ওকে দেখে হাঁ।

—কেয়া ভাবী? আরে! আপ ভিগ রহে হ্যায়।

—হাঁ। তুম ভি নাহা লো। মওসম কা পহেলি বারিষ, এনজয় করো।

—নহি ভাবী। আইব্বাপ! জুখাম হো যায়েগা!

বলতে-বলতে দৌড় দিল ভিতরের দিকে।

পিছন-পিছন একটা কোয়ালিস হেডলাইট জ্বেলে ঢুকল কম্পাউন্ডে। অরিত্র নামল।

দুষ্টুমি বুদ্ধি জাগল অহনার। ওই অবস্থায় একছুটে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়াল।

ডিং-ডং!

দরজার ল্যাচ ঘুরিয়ে অহনা এককোণে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘর অন্ধকার। ব্রিফকেস হাতে ভিতরে ঢুকতে গিয়ে অরিত্র থমকে দাঁড়াল।

—অনি? অ্যাই অনি?

অমনি অরিত্রকে পিছন থেকে জাপটে ধরল অহনা।

—অ্যাই, অ্যাই কী হচ্ছে? ছাড়-ছাড়।

—ছাড়ব না! আজ তোকে কিছুতেই ছাড়ছি না।

—আরে, আরে! তুই যে ভিজে চুপচুপে। দ্যাখো, দ্যাখো, আমায় ভিজিয়ে দিলি।

—তো কী হয়েছে? এখন কি অফিস যাবি নাকি? খুলে ফ্যাল। সব ছেড়ে ফ্যাল।

অহনার শরীরে উথালপাথাল শুরু হয়ে গেছে। ও পটাপট অরিত্রর জামার বোতাম খুলতে থাকে।

—উ:, পাগলামি করিস না। প্লিজ। এগুলো রাখতে দে। জুতোটাও ছাড়িনি।

অহনার কান-মাথা দিয়ে গরম নি:শ্বাস বইছে। তর সইছিল না। হাত বাড়িয়ে অরিত্রর ব্রিফকেস রেখে দিল সেন্টার টেবিলে।...

—চল চল! দুজনে আজ একসঙ্গে চান করব।

একছুটে শোবার ঘর থেকে তোয়ালে নিয়ে এল। তারপর অরিত্রকে টানতে-টানতে নিয়ে ঢুকল স্নানঘরে।

—ম্যাম, ভেজ অর ননভেজ?

ট্রলি নিয়ে এসেছে বিমানসেবিকারা।

—নো, থ্যাঙ্কস। ওনলি টি।

শাওয়ারের নীচে উন্মুক্ত অবগাহন। আজ অহনা আগ্রাসী ভুমিকায়। সাবান মাখিয়ে দিচ্ছে অরিত্রের সর্বাঙ্গে।

কিন্তু...অরিত্রের হল কী? ও জাগছে না কেন? বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, হয়েই চলেছে। বাথরুমের জানলা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস ঢুকছে। ঠান্ডা জলস্রোত নামছে। অহনা পাগলের মতো চেষ্টা করে যাচ্ছে।

অরিত্র নিশ্চুপ। অরিত্র অসাড়।

—অরি, তোর হল কী?

শুকনো তোয়ালে দিয়ে অরিত্রর শরীর মুছিয়ে দিতে-দিতে বলে উঠল অহনা।

—কী আবার হবে? নাথথিং! যখন-তখন হয় নাকি? সবকিছুরই সময় আছে।

—তোর তো দু-মাস ধরে কখনোই হচ্ছে নারে। এনি প্রবলেম?

—কিছু না। আয়াম ফাইন। নরম্যাল। টোটালি ফিট।

—দ্যাখ অরি, ডোন্ট কনফাইড। তুই রেসপনড করছিস না। রাদার করতে পারছিস না। মে বি মেন্টাল। মে বি কম্প্যুটারে তুই অবসেসড হয়ে আছিস। প্লিজ ট্রাই টু

আন্ডারস্ট্যান্ড।

—সো হোয়াট? কী বলতে চাইছিস?

—বলছি, এতে লজ্জার কিছু নেই। দিস ইজ পিওরলি টেম্পোরারি। চল, দুজনে একদিন ডক্টরের কাছে যাই।

—ডক্টর? হোয়াই? সেক্সোলজিস্ট?

—ধুর! সাইকিয়াট্রিস্ট। সমস্যা খুলে বলব। দু-চারদিন কাউন্সেলিং করলে ঠিক হয়ে যাবে।

—আমার কোনও সমস্যা নেই। নো প্রবলেম। তোর প্রবলেম হলে তুই যা।

—আমি যাব? এটা কি আমার প্রবলেম?

—আই থিঙ্ক সো। তোর মধ্যে অ্যাবনরম্যালিটি গ্রো করছে। য়ু আর গেটিং ম্যানিয়াক। বড্ড খিদে বেড়ে গেছে।

—ওয়াট?

—ইয়েস। য়ু মে ডিসএগ্রি। বাট, দ্যাটস দ্য ট্রুথ। অবশ্য তোর হাতের কাছে অপশন আছে। য়ু ক্যান অ্যাভেল দ্যাট। আই ওন্ট মাইন্ড।

—কী বলছিস? আই কান্ট ফলো।

ড্রেসিং টেবিলের সমানে দাঁড়িয়ে চুল আচড়াতে-আচড়াতে অরিত্র খুব স্বাভাবিক গলায় বলল,—আমি রবির কথা বলছি। তোর কাছে তো রোজই আসে, খবর পাই। জানি না, কদ্দূর এগিয়েছিস। তবে আমার দিক থেকে কোনও আপত্তি নেই।

—ক-কী! ত-তুই...!

রাগ, বিস্ময়, যন্ত্রণায় মুহূর্তের জন্য বাকরুদ্ধ অহনা। তারপর সে ছুটে গিয়ে দু-হাতে ঝাঁকাতে থাকে অরিত্রকে।

—অরি! অরি! আর য়ু ইন সেন্স? রবি-রবি—ও আমার ছোটভাইয়ের মতো...তুই সব জেনেও—

—সব কি জানা যায় রে? আমি তো বলেই দিলাম, রবি আছে তোর হাতের কাছেই। তোর খিদে তুই মিটিয়ে নিতে পারিস। আমার কোনও ছুঁতমার্গ নেই। আফটার অল...

অরিত্র এরপর কী বলে গেল, শোনা হয়নি অহনার। ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে সে।

ছি:-ছি:! কথাগুলো কানে গরম লোহার মতো পুড়ছে।

সটান গেস্টরুমের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে সে। শেষ! সব শেষ!

'ভেরি শর্টলি উই আর ল্যান্ডিং টু কলকাটা নেতাজি সুভাষ ইন্টারন্যাশন্যাল এয়ারপোর্ট। প্যাসেঞ্জার্স আর রিকোয়েস্টেড টু ফাসন দেয়ার সিট-বেল্ট...

অহনা উইন্ডো দিয়ে বাইরে তাকাল। নীচে আলোর মালায় ভাসছে ওর শহর।

কতক্ষণে যে বাড়ি পৌঁছবে?

প্রথমে ঠিক করেছিল, ওই রাতেই বেরিয়ে আসবে অরিত্রর ফ্ল্যাট থেকে। তারপর মত বদলাল। রাতের দিল্লি মোটেই নিরাপদ নয়।

সকাল হতে ও বাথরুমে, কিচেনে আওয়াজ পেয়েছে। অরিত্রর কোনও বিকার নেই। নিজেই ব্রেকফাস্ট বানিয়ে, চান করে আটটা নাগাদ অফিসে বেরিয়ে গেছে।

তখন শুরু হয়েছে অহনার কাজ। ফোন করেছে, পরিচিত ট্রাভেলসে। পার্সোন্যাল অ্যাকাউন্ট থেকে এটিএম-এ টাকা তুলেছে। পাশের সাইবার কাফেতে গিয়ে ক্রেডিট কার্ডে প্লেনের টিকিট কেটেছে। ফ্ল্যাটে ফিরে ওর যা কিছু জামাকাপড়, অর্নামেন্টস গুছিয়ে নিয়েছে বিয়েতে পাওয়া দু-দুটো ট্রলি ব্যাগেজে।

ঠিক সাড়ে ন'টায় ট্রাভেলস-এর ইন্ডিকা রিপোর্ট করেছে।

অহনা ফ্ল্যাটে চাবি দিয়েছে। সিকিউরিটির ছেলেটার কাছে চাবি জমা দিয়েছে। তারপর লাগেজ তুলে বেরিয়ে পড়েছে গাড়িতে।

কোথায় যাবে? চিত্তরঞ্জন পার্কে অদিতি জেঠিমণির কাছে যাবে? জেঠু না থাকলেও জেঠিমণি নিশ্চয়ই থাকবে। অনেকদিন যেতে বলেছে। নাহ! পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করছে না। বেকার সাজিয়ে-গুছিয়ে মিথ্যে কথা বলতে হবে।

তাহলে? যে করে হোক, অন্তত চারটে পর্যন্ত সময়টা তো কাটাতে হবে।

রাস্তায় একটা ছোট ধাবায় ব্রেকফাস্ট করেছে। তারপর শপিং মলগুলোয় ঢুকেছে, একেকটা ফ্লোরে বারবার ঘুরেছে। মাঝে-মাঝে মলের কফি-শপে কাপ নিয়ে বসেছে, আবার উঠেছে।

মাকে ফোন করেছে দশটা নাগাদ, 'কলকাতা আসছি।'

ড্রাইভার রতন দাঁড়িয়ে ছিল গেটের মুখে। দিদিমণিকে দেখে হাসল। ট্রলিটা টেনে নিল। পিছু-পিছু হাঁটছে অহনা।

ওয়াগন-আরের দরজা খুলে শরীর ফেলে দিল পিছনের গদিতে। আ:! কী শান্তি।

কলকাতাতেও বৃষ্টি। টিপটিপ করে হচ্ছে। ঠান্ডা জোলো বাতাস ঢুকছে হু-হু করে। দু-ধারে পেরিয়ে যাচ্ছে কইখালি, তেঘরিয়া, বাগুইআটি...।

তিন লাফে তিনতলা উঠে এল। মা দাঁড়িয়েছিল সিঁড়ির মুখে। মাকে দেখেই যত কান্না ঠেলে বেরোল ভিতর থেকে। মাকে জাপটে ধরল।

—মা—!

—সব ঠিক হয়ে যাবে। ওরকম হয়।

মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে মা বলল, চল। ভিতরে চল।

কতদিন পরে মায়ের হাতের রান্না চেটেপুটে খাচ্ছে। এতক্ষণে বুঝতে পারছে, কী ভীষণ খিদে পেয়েছিল।

বাবা পাশে দাঁড়িয়ে মুচকি-মুচকি হাসছে।

ওর রাগ হয়ে গেল, মা! পাপা হাসছে কেন?

—হাসছে কেন, আমি কী করে বলব? বাবাকে জিগ্যেস কর!

বাবা বলল, হাসছি তোর রাগের সেন্টিগ্রেড দেখে! এত রাগ যে দিল্লি থেকে সটান কলকাতা চলে এলি। কবে যে তোদের ম্যাচুওরিটি হবে।

—মা-মা, পাপা কিন্তু প্রচুর বাজে বকছে! বারণ করে দাও! আর হোয়াট ডু য়ু মিন বাই 'তোদের'? নো প্লুরাল। যা বলার আমায় বলো, যত ইচ্ছে বলো! বাট আমার সঙ্গে কাউকে জড়িও না!

বলতে-বলতে ও ফুঁসে উঠল, তুমি-তোমরা জান, কী ঘটেছে? কতখানি ডার্টি ওই ছেলেটা?

মা মাথা নাড়ল, শুনেছি।

—ও:, বা:! তিনি অলরেডি সাফাই গেয়ে দিয়েছেন! আর তোমরাও বিশ্বাস করে নিয়েছ। বেশ, বেশ।

—মামন, আজ এসব কচকচি থাক। কাল সব শুনব। তুই টায়ার্ড, শুয়ে পড়। তোর ঘরে বিছানা করে দিয়েছি।

চোখ জড়িয়ে আসছিল। তার মধ্যেও উড়ে-উড়ে আসছিল প্রশ্নগুলো, অরিত্র কখন জানাল মাকে? অথচ কাবেরী আন্টি ওকে ফোনে পাচ্ছিল না। কী বলেছে, কীভাবে বলেছে? তার মানে দু-বাড়ির সবাই জেনে গেছে? কী জেনেছে? ও ম্যানিয়াক?...

না:, আর ভাবতে পারছে না।

কত রাত্তির জানে না, হঠাৎ যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। ছটফট করে জেগে গেল অহনা। একজন তার শরীর দিয়ে চেপে ধরেছে। ওর ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে সব শুষে নিচ্ছে।

—ক-কে?

—শ-শ, চুপ, চুপ। অনি, আমি!

—ছাড়! গেট অফ!

—অনি, আয়াম সরি!

—নো সরি। য়ু—

—অনি, প্লিজ! আমি ক্ষমা চাইছি। একটা সুযোগ দে।

—ক্ষমা? ফর হোয়াট?

—আমি তোকে অত নোংরা কথা বলেছি। বিশ্বাস কর, মন থেকে বলিনি। আউট অব ফ্রাস্টেশন বলেছি।

—নো-ও! আই ওন্ট বিলিভ। তোর সঙ্গে—

—প্লিজ অনি, গিভ মি ওয়ান চান্স। আর কোনওদিন হবে না। আই লাভ য়ু অনি। কাল সারারাত আমিও ঘুমোইনি রে। ডিসিশন নিয়ে ফেলেছি। আজ ভোরে উঠেই সোজা এয়ারপোর্ট। কলকাতা। কাকু-কাকিমাকেই প্রথম জানিয়েছি। সত্যিটাই বলেছি, বিশ্বাস কর। গেছিলাম সল্ট লেকে আমাদের পুরোনো কম্পানিতে। দে হ্যাভ অ্যাগ্রিড।

—উ:! দম আটকে আসছে।

—অনি, তোকে আর দিল্লি ফিরতে হবে না রে। আমি জাস্ট এই মাসটা শেষ করে তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে আসব। কলকাতাতেই থাকব। উই কান্ট অ্যাডজাস্ট ইন ডেলহি।

বুঝে গেছি। তুই ঠিক বলেছিস অনি, কম্পিউটার আমায় গিলে ফেলছিল। সব অনুভূতি ভোঁতা হয়ে যাচ্ছিল। নেশা। অ্যাডিকশন!

—ত-তুই...তোকে...

—কী করবি? মারবি? মার, যতখুশি মার। গালাগালি দে। তবু তোকে ছাড়ব না। এখন কী করব জানিস? যা-তা করব। ইচ্ছেমতো—

—উ:, একটু ছাড়। বৃষ্টি আসছে। জানলাটা বন্ধ করি।

—না। আসুক বৃষ্টি, সব ভিজে যাক। কাল তুই আমায় রেপ করেছিস, আজ আমি বদলা নেব। কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না। করব লড়ব জিতব রে, জিতব।

বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি নামল।

আলাপ

আজ অফিসে চাপ ছিল। ফিরতে আটটা বেজে গেছে। তারপর চান করে পাজামা-ফতুয়া চড়িয়ে টিভির সামনে বসতে আরও আধঘণ্টা। তবু অভ্যেস। যত রাতই হোক, বাড়ি ফিরে এক কাপ চা চাই-ই।

গীতাদি চা রেখে গেল। রোজকার মতো নিউজ চ্যানেলগুলো সার্ফ করছে পুট-পুট করে। কিন্তু কিছুই দেখছে না। মন অন্যদিকে। চায়ে চুমুক দিচ্ছে।

এই সময় মা ঘরে ঢুকলেন। ও সোজা হয়ে বসল।

'কীরে খোকন, কবে যাচ্ছিস?'

'কোথায়?'

'কোথায় আবার! ওদের বাড়ি। বারবার ফোন আসছে। গিয়ে একবার দেখে আয়। তারপর পাকা কথা-আশীর্বাদ, পাঁজি দেখে দিনক্ষণ ঠিক করা...অনেক কাজ রে। তোর বাবা আজ থাকলে আমার কি কিছু ভাবনা থাকত!

মা বড় করে শ্বাস ফেললেন।

এই রে! মা রেকর্ড চালিয়ে দিয়েছে। আজ সহজে থামবে বলে মনে হচ্ছে না। অনেকটা এগিয়ে গেছে। ওর ছোটমাসির পিসতুতো দেওরের মেয়ে। ছোটমাসির খুব পছন্দ। মা দেখে এসেছে। একরকম কথা দিয়ে দিয়েছে।

মায়ের কাছে সবটা শুনে ভালোই লেগেছিল। ডানাকাটা পরী না হলেও বেশ সুশ্রী। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট করছে। শিক্ষিত ফ্যামিলি। বলতে গেলে ওর প্রচ্ছন্ন সায় পেয়েই মা এগিয়েছে।

কিন্তু এখন যে হঠাৎ অন্য একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে। নিজেই ফেঁসে আছে। গত কয়েকদিন হল নেশাগ্রস্তের মতো...কী যে করা যায়? এখন মাকে কিছু বলাও যাবে না। বাড়িতে তুলকালাম শুরু হয়ে যাবে। কান্নাকাটি, আত্মীয়স্বজনকে ডেকে...ভাবতেই শিউরে উঠছে।

মা গড়গড় করে বলে যাচ্ছে, 'তুই তা-না-না করছিস কেন, বুঝতে পারছি না। তুই না বললে আমি এগোতাম না। বললি, বিয়ে করবি। কোনও পছন্দ করা মেয়ে নেই। বয়েসও তো কিছু কম হয়নি।...অ্যাই খোকন, চুপ করে আছিস কেন? বল!

নাহ! মাকে থামাতেই হবে। উপায়? উপায়?

ঠিক, ঠিক! ও সরাসরি কথা বলবে। বলবে, আপনি ক'টা দিন অপেক্ষা করুন। একটু সমস্যায় আছি, আমি জানাছি। সে আবার কীভাবে নেবে? হাজার হোক, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সম্বন্ধ।

এছাড়া আর উপায়ও নেই। একটু ঘুরিয়ে, কায়দা করে বলতে হবে। এরমধ্যে ওদিকের খবরাখবর নিয়ে, তারপর যা হোক ফাইন্যাল।

'কী রে খোকন, কী হল তোর? আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস না?'

'মা, একটা কথা বলব? তুমি বরং আমায় ফোন নম্বরটা দাও।'

'কার? ওদের বাড়ির? কেন রে?'

'আহা, ওদের বাড়ির নয়। ওর, মানে তোমার পাত্রীর। কী যেন নাম, পত্রলেখা, ওর। য়ুনিভার্সিটি যাচ্ছে যখন, মোবাইল নিশ্চয়ই আছে। আমি একটু কথা বলব ওর সঙ্গে। বুঝতেই তো পারছ, আজকালকার মেয়ে। পছন্দ-অপছন্দ খুব বেশি। দেখতে যাওয়া-টাওয়া হয়তো ভালোভাবে নেবে না। তার চেয়ে আগে ফোনে কথা বলে নিলে ব্যাপারটা সহজ হবে। বুঝলে?'

মায়ের মুখে মুহূর্তে আলো জ্বলে উঠল।

'বুঝেছি, বুঝেছি। দাঁড়া, এখনই তোর মাসিকে জিগ্যেস করে জেনে নিচ্ছি।'

মা প্রবল উৎসাহে বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন এক টুকরো কাগজ আর একগাল হাসি নিয়ে।

'এই নে। কথা বল। ওফ। আমরা পুরোনো মানুষ, তোদের মতিগতি কিছুই বুঝতে পারি না।...খাবার আগে বলিস। গীতা গরম করে দেবে।'

টুকরোটা হাতে নিয়ে ও বসে আছে। ভাবছে। ঠিক কোথা থেকে শুরু করবে?

ধ্যুৎ! সারাদিন কত কাস্টমারকে ও বুঝিয়ে-সুজিয়ে রাজি করাচ্ছে, বছর তেইশের মেয়েকে ঠিকঠাক বোঝাতে পারবে না? মোবাইলের বোতাম টিপল।

'হ্যালো। পত্রলেখা বলছেন?'

'বলছি।'

'প্রতীক বলছি। চিনতে পারছেন?'

'পারছি। বলুন, কী বলবেন।'

প্রতীক হোঁচট খেল। কী কাঠখোট্টা কথা! ওর নাম শুনেও এভাবে বলছে।

'কী হল? কী বলবেন, বলে ফেলুন।'

কণ্ঠস্বরে উষ্মা স্পষ্ট। প্রতীক নার্ভাস হয়ে যাচ্ছে।

'আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমার আপনাদের বাড়ি যাওয়ার কথা। ইয়ে, আপনার সঙ্গে কথা বলতে। সেই ব্যাপারেই ইয়ে—'

'ইয়ে—কী? কী বলতে চান, পষ্টাপষ্টি বলুন। যদি অসুবিধে থাকে, বলার দরকার নেই। তার চেয়ে বরং আমার কথা শুনে নিন!'

'আ-আপনার কথা?'

'হ্যাঁ, আমার কথা। আমি সোজা কথা বলতে এবং শুনতে পছন্দ করি। আপনি আমাদের বাড়ি আসবেন, বলছিলেন তো? আপনি না এলেই আমি খুশি হব।'

'ম-মানে?'

'মানে খুব পরিষ্কার। ন্যাকা ছেলেদের আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না।'

'আমি হ্যা-হ্যা...'

'হ্যা-হ্যা করার কিছু নেই। আপনি যে বেসিক্যালি লোভী টাইপের লোক, সেটা জানতে পারার পর থেকে আমার গা-পিত্তি জ্বলে যাচ্ছিল। এখন দেখছি, আপনি ন্যাকাও। সোজা কথা বলার মতো সৎসাহস আপনার নেই।'

প্রতীকের কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে। টপ-টপ করে ঘাম ঝরছে কানের পাশ দিয়ে।

'ক-কী বলছেন, কিছু বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে পারছেন না? বা:! তার মানে আপনি শুধু লোভী ও ন্যাকা নন, ডাহা একটি মিথ্যেবাদীও।'

'শুনুন, শুনুন। আপনি কিন্তু লিমিট ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।'

'তাই? আপনি গত প্রায় পনেরো দিন ধরে একটি মেয়েকে ফলো করছেন না? একই বাসে উঠছেন, তাকে টার্গেট করে কাছাকাছি সিটে বসছেন অথবা দাঁড়িয়ে থাকছেন; হাঁ করে তাকিয়ে থাকছেন; সে নেমে যাওয়া পর্যন্ত। করেননি? এমনকী, সে যখন অস্বস্তি ও দুশ্চিন্তায় পড়ে বাস চেঞ্জ করল, দু-চারদিনের মধ্যে আপনিও ঠিক টের পেয়ে ওই বাসেই উঠে পড়লেন। কী, কিছু ভুল বলছি? লজ্জা করে না আপনার? শুনেছি আপনি নাকি শিক্ষিত, ব্যাঙ্কে চাকরি করেন। ছি:-ছি:-ছি:!'

কী করবে? ফোন কেটে দেবে? অসহ্য! কানের মধ্যে যেন গরম সিসে ঢালছে। প্রতীক নিজেকে গুছিয়ে নিতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

'...কী হল, চুপ করে গেলেন কেন? আপনারা মেয়েদের কী ভাবেন, বলুন তো? খুব সস্তা?'

'আমায় একটু বলার সুযোগ দেবেন? আপনার শেষ হয়েছে?'

'কী বলবেন? বলবেন, এটা বাজে কথা?'

'মোটেই নয়। আপনার প্রতিটা কথা সম্পূর্ণ সত্যি।'

'তবে?'

'বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, এই কথাগুলো আলাদাভাবে বলার জন্যেই আমি আপনাকে ফোনটা করেছিলাম। আমার মা-মাসি আমার সঙ্গে আপনাকে জুড়ে দিতে অনেকটা এগিয়ে গেছেন। এদিকে আমি হঠাৎ সমস্যায় পড়ে গেছি। ওই মেয়েটিকে দেখার পর থেকে...কী বলব, হয়তো ফের আপনি আমায় ন্যাকাট্যাকা বলবেন, আমি—আমি যাকে

বলে লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। অথচ তাকে চিনিও না, জানিও না। সে কোথায় থাকে, কেমন ফ্যামিলি, আগে থেকে এনগেজড কিনা, এগুলো জানা দরকার।

'এ ব্যাপারে আমায় বলার কী আছে?'

'বলার না থাকলেও ডিসিসন নেওয়ার আছে। বিশ্বাস করুন পত্রলেখা, আপনি এটাও খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন, জীবনে আমি এইরকম অবস্থায় কোনওদিন পড়িনি। সময় পাইনি, ইচ্ছেও হয়নি।'

'তাই? এখন আমায় কী করতে হবে?'

'কিছু না। শুধু আমায় ক্ষমা করে দিন। প্লিজ। আমি আপনাকে ঠকাতে চাইনি। আর মানে...আমার এই গোপন ব্যাপারটা যেন মা-মাসির কান পর্যন্ত না পৌঁছোয়! প্লিজ।'

'হুঁ।...ঠিক আছে। তবে আমারও একটা শর্ত আছে।'

'শর্ত?'

'হ্যাঁ। আপনি যে লোভী ও ন্যাকা নন, সেটা আপনাকে প্রমাণ করতে হবে। সরাসরি তার সঙ্গে গিয়ে কথা বলতে হবে। রাজি?'

'সরাসরি কথা বলব? হ্যাঁ, আমি রাজি। নিশ্চয়ই বলব। কিন্তু সেই সুযোগ পাব কি করে? কোথায়...কখন...বাসে ছাড়া তো...

'না-না। বাসে নয়। এমনিতেই সে আপনার ওপর দারুণ খেপে আছে। আমি দেখছি।'

'আপনি তাকে চেনেন?'

'আপনি বেশ বোকা আছেন। না চিনলে আপনার এই কীর্তি জানলাম কি করে! আমি আপনাকে টাইম এবং জায়গা জানিয়ে দেব। বারবার সুযোগ পাবেন না। যা বলার ওদিনই বলে ফেলবেন।'

দশ মিনিট হল, প্রতীক দাঁড়িয়ে আছে। ঘন-ঘন ঘড়ি দেখছে। দুটো বাজতে এখনও কয়েক মিনিট বাকি।

আজ দুটো লোন স্যাংশনের কেস ছিল। ম্যানেজারকে অনেক তেল মাখিয়ে, ক্লায়েন্টদের কাল আসতে জানিয়ে সেকেন্ড-হাফ ছুটি মিলেছে। সকাল থেকে ব্যাপক কাজের চাপ ছিল। মাথা তোলার ফুরসত পায়নি।

প্রতীক মনে-মনে কাল্পনিক সংলাপ ভাবার চেষ্টা করে। কী বলবে সে রহস্যময়ীকে? রেগে আছে। রাগ ভাঙাবার চেষ্টা করবে? পত্রলেখা বলল, বারবার সুযোগ পাবেন না। আজই প্রোপোজ করবে? সে হয় নাকি! আলাপই হয়নি। শুধু চোখে দেখা। পত্রলেখার রেফারেন্স টেনে কথা বলবে? হ্যাঁ, সে বরং ভালো।

উলটোদিকে বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজের গেট। ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে বেরিয়ে আসছে। প্রতীক তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে সবদিকে। রহস্যময়ী কি সায়েন্স কলেজে পড়ে? সম্ভব। নামত হাজরা ল কলেজ স্টপে। ভিতর দিয়ে হয়ত রাস্তা আছে।

এই সময় সে বেরিয়ে এল। গাঢ় নীল সালোয়ার কামিজ। দু-এক কুচি চুল উড়ছে হাওয়ায়। কাঁধে ঝোলা ব্যাগ।

প্রতীক মুগ্ধ হয়ে গেল। একইসঙ্গে বুকের মধ্যে ধক-ধক...।

একবার মুখ তুলে তাকাল। প্রতীককে দেখে নিয়েছে। সোজা রাস্তা পার হচ্ছে।

একেবারে মুখোমুখি।

প্রতীকের গলা কেঁপে গেল, 'নমস্কার। আমি প্রতীক। প্রতীক বসু।'

'জানি। বলুন।'

'হ্যাঁ, মানে বাসে, একই বাসে আমরা..কয়েকদিন ধরে...'

'আমায় ফলো করছেন।'

'না-ঠিক তা নয়। আপনাকে আমার...পত্রলেখা বললেন সরাসরি কথা...'

'জানি। আমায় চিনতে পেরেছেন?'

'চেনা মানে...পত্রলেখার কাছে যেটুকু শুনেছি...'

'উফ! এখনও চিনতে পারছেন না! আপনি একটি আস্ত ভ্যাবলা কার্তিক!'

'আ-আপনি...?'

'উফ! কী লোক আপনি! মার্কেটিং ম্যানেজাররা যে এত বোকা হয়, জানতাম না। ভেবে বলুন তো, আগে অন্য কোনওভাবে..না:! মাথায় সত্যিই...আরে ফোটোতেও কখনও দেখেননি?'

প্রতীকের আরও সব গুলিয়ে গেল। সে মাথা চুলকোতে শুরু করেছে।

'হ্যাঁ, চুলকোন। ভালো করে চুলকোন। আর মিস্টার গঙ্গারাম। আমিই পত্রলেখা।'

'প-ত্রলেখা! আপনি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। কাল অনেক ভেবেচিন্তে দেখলাম, আপনি বেশ বোকা। আই-কিউ লেভেল প্রায় জিরো। আপনাকে ঘষেমেজে তোলার দায়িত্ব আমাকেই নিতে হবে। তাই এবারের মতো ক্ষমা করে দিলাম।'

প্রতীক বুঝে উঠতে পারছে না, ওর ভিতরে এখন ঠিকঠাক কী ঘটছে। বড় বড় মাছ ঘাই মারছে।

'কী হল, এখনও হাঁ করে তাকিয়ে আছেন কেন? বললাম তো, আপনার সব হ্যাংলামি ক্ষমা করে দিয়েছি। মোড়ের ধাবা চেনেন তো! চলুন, ওখানে বসে আপনার ঘাড় ভেঙে চা-সিঙাড়া খাব। আপনি ভালো করে আলাপ করে নিতে পারবেন। যাবেন তো, নাকি?'

আরও একবার

সবজির বাজার শেষ করে সবে থলিটা তুলেছে। পিছন থেকে ডাক।

'সুকান্তদা! ও সুকান্তদা! আগে এদিকে।'

গলা শুনেই বুঝতে পেরেছে। মাছের দোকানের বাপী। হাত নেড়ে তুমুল উৎসাহে ডাকছে, 'আগে বেছে নিয়ে যান! টাটকা ইলিশ। ফুরিয়ে যাচ্ছে।'

সুকান্ত অন্যদিনের মতো সেদিকেই পা বাড়াল।

যখন থেকে সল্টলেকে পাকাপাকি সংসার পেতেছে, তখন থেকে সপ্তাহে অন্তত: একদিন মানিকতলা বাজারে আসে সুকান্ত। দেখতে-দেখতে প্রায় পাঁচ বছর হয়ে গেল। কাঁচা বাজারের লোকজন চেনা হয়ে গেছে। তার মধ্যে স্পেশাল হচ্ছে মাছের বাপী আর সবজির শ্যামল। এদের কাছ থেকে কিছু-না-কিছু নিতেই হয়। দাম ঠিকঠাক নেয়, খাতিরও করে।

আজ বাজারে প্রচুর ইলিশ উঠেছে। ছোট-বড় নানান সাইজের। বাপীর মাছের দোকানের সামনে বেশ ভিড়।

সুকান্ত একটু পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে-সঙ্গে বাপীর ইঙ্গিতে বুড়ো চা-ওয়ালা ভাঁড়ের চা হাতে ধরিয়ে দিল।

'দাদা, একটু!...এনাদের ছেড়েই আপনাকে দিচ্ছি। চা খান।' বাপী ঘ্যাচঘ্যাচ করে মাছ কাটতে-কাটতে বলল, 'কাল আপনাকে, নরম-গরম পোগ্রামে দেখলাম। বার্তা চ্যানেলে।...দাদা, বিদেশেও রবি ঠাকুরকে নিয়ে বাঙালিদের এত মাতামাতি? সত্যি? ওখানেও রবীন্দ্র-জয়ন্তী হয় আমাদের মতো?'

'হয় তো।' সুকান্ত হাসল, 'ওদের সব অনুষ্ঠানেই রবীন্দ্রনাথ। ওদের ছেলেমেয়েরা বাংলা পড়তে পারে না। তাই ইংরেজি হরফে রবীন্দ্র সংগীত লিখে নিয়ে আসে। একদল ওই স্ক্রিপ্ট দেখে-দেখে গায়, আরেকটা দল তালে-তালে নাচে। সে খুব মজার ব্যাপার! উচ্চারণ শুনে মনে হয়, সায়েব-বাচ্চারা গাইছে।'

'সত্যি দাদা? আপনি কত কিছু জানেন। কী সুন্দর গুছিয়ে বলেন। আপনার বউমা আপনাকে টিভিতে দেখলেই আমায় ডেকে নিয়ে যায়। ও আপনার ফ্যান।'

মাছ কাটতে-কাটতে বাপী বলে যাচ্ছিল। সুকান্ত সলজ্জ হাসিতে মুখ ভরিয়ে রেখেছিল।

হঠাৎ শরীরের শিরদাঁড়া বেয়ে বিদ্যুৎ নেমে গেল।

বাপীর কথা শুনে খদ্দেরদের অনেকেই ঘুরে-ঘুরে ওকে দেখছিল। তাদের মধ্যে অতি পরিচিত একটা মুখ! কাঁচাপাকা কোঁকড়া চুল, ঝোপড়া গোঁফ, চশমার ফাঁকে গভীর দুটি চোখ।

এখনও ওর দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে।

'অ-অতীন ত-তুমি!'

'যাক, চেনা গেছে তাহলে!'

'চ-চিনব না কেন? ক-কী যে বলো? ত-তুমি বাইরে ছিলে না?'

'ছিলাম। প্যারিসে। দুমাস হল, সব বেচেবুচে দিয়ে ফিরে এসেছি। পার্মানেন্টলি।'

'তাই? কেন?'

'লোনলি লাইফ। ফিফটি ক্রস করার পরে ওসব দেশে সিঙ্গল লাইফ লিড করা ভেরি টাফ। আচ্ছা সুকান্ত, আমাদের সম্পর্কটা ওরিজিন্যালি কী ছিল? তুমি না তুই?'

'না-মানে...হ্যাঁ তুই...কিন্তু কুড়ি বছর পরে...'

'কুড়ি বছর পরে সব ঝাপসা হয়ে গেছে, মরচে পড়ে গেছে, তাই কি?'

'ঠিক তা নয়। তবে—'

'তবে আর কিছু হয় না সুকান্ত। আমি কি সুকান্তকে 'তুই' ডাকতে পারি?'

'নিশ্চয়ই! একশোবার!...অ্যাই বাপী, এই সায়েব আমার ছোটবেলার বন্ধু। ঠিকঠাক মাছ দিয়েছ তো?'

'কী যে বলেন দাদা!' একগাল হেসে বাপী বলল, 'একনম্বর মাল দিয়েছি। আমরা লোক চিনি না? উনি আগের দিনও আমার কাছ থেকে নিয়েছিলেন। তাই না স্যার?'

অতীন ঘাড় নাড়ল।

সুকান্ত বলল, 'তারপর বল, তোর খবর কী? ভালো আছিস তো?'

'ভালো?' অতীন কি দীর্ঘশ্বাস ফেলল? বোঝা গেল না। থেমে-থেমে বলল, 'ভালো-মন্দ নতুন করে আর কী হবে? যা হওয়ার সে তো হয়েই গেছে।...বুঝতেই পারছিস...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি।' সুকান্ত তাড়াতাড়ি বলল, 'চল, আমরা বাইরে গিয়ে কথা বলি।...বাপী, কী হল? তাড়াতাড়ি আমায় দাও!'

'দিচ্ছি দাদা। এনাকে ছেড়েই। পাঁচটা মিনিট।'

'ঠিক আছে সুকান্ত। তুই মাছ নিয়ে আয়। আমি বাইরে একটু স্মোক করছি।'

'ওকে ওকে।'

অতীন ব্যাগ নিয়ে বাইরের দিকে গেল। সুকান্ত লম্বা শ্বাস ছাড়ল। উ:! এতক্ষণ পরে একটু গুছিয়ে নেওয়ার সময় পাওয়া গেছে।

কী করবে? মাছ নিয়ে অন্য গেট দিয়ে বেরিয়ে যাবে? অতীনের মুখোমুখি আর হতে হবে না?

না-না। এভাবে পালিয়ে বাঁচা যায় নাকি? অতীন কলকাতায় চলে এসেছে। এরপর আবার দেখা হয়ে যেতে পারে। তখন? তাছাড়া—কেন? পালাবে কেন? ও কি চোর?

হ্যাঁ, চোরই তো! চুপিচুপি ঘরে ঢুকে—

বাজে কথা! কোনওকিছুই চুপিচুপি হয়নি। যা হয়েছে, জেনেশুনেই হয়েছে। শর্মিলার মত নিয়েই হয়েছে। এম.এস.সিতে দুজন যখন এককলেজ থেকে এসে ভর্তি হল, সবাই ওদের বলত, মানিকজোড়। হরিহর-আত্মা। দুজনের পছন্দও এক। দুজনেরই পছন্দ শর্মিলা। তখন কেউ কাউকে জানাল না। শর্মিলা কি এটা বুঝত না? জানত না? বিয়ের পরে এসব নিয়ে কম হাসাহাসি হয়েছে? সুকান্ত প্রোপোজ করার সাহস পায়নি, অতীন

পেরেছিল। তাই পি.এইচ.ডি. করতে-করতে ওদের দুজনের বিয়ে হয়ে গেল। সুকান্ত তারপরেও কিন্তু অতীন-শর্মিলাকে ছাড়েনি। বিয়ের পরেও তিনজনকে দেখা যেত একসঙ্গে। সেই নিবিড় বন্ধুত্ব।

সহজ সরল গতিতেই বয়ে যাচ্ছিল সময়। অতীন, শর্মিলা, সুকান্ত তিনজনে প্রায় একইসঙ্গে কলেজে চাকরি পেল।

একসঙ্গে তার সেলিব্রেশন হল।

বন্ধুরা হই-হই করতে করতে খাওয়া-দাওয়া করল। কয়েকজন বলল, 'সুকান্ত, এবার তুই বিয়েটা করে ফ্যাল। আর কতদিন কাবাব মে হাড্ডি হয়ে থাকবি?'

সুকান্ত শুধু হেসেছিল।

এরপর...এরপর অতীন-শর্মিলার নতুন অতিথি এল। কাকু সুকান্তও তাকে নিয়ে মেতে উঠল।

ছোট্ট ঝিনুকের যখন চার বছর বয়েস, তখনই তো ঘটনাটা ঘটল। অবশ্য তার পিছনে নতুন একটা কেমিস্ট্রি দানা বেধে উঠছিল অনেক আগে থেকে।...অতীন কেন বুঝতে পারেনি? কেন জানতে পারেনি? সেটা কি সুকান্তর দোষ?

'দাদা, এই নিন।' বাপী ব্যাগ এগিয়ে দিল।

সুকান্ত একঝটকায় বর্তমানে ফিরে এল, 'কত হয়েছে তোমার?'

'পাঁচশো কুড়ি। দুরকম মাছ দিয়েছি। আপনি পাঁচশোই দিন।'

ব্যাগ হাতে বেরিয়েছে সুকান্ত। ওই যে। অতীন দাঁড়িয়ে আছে। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট পুড়ছে।

একটু দূরে ফুটপাথে চায়ের দোকান। পাশাপাশি দুজনে সেদিকেই হাঁটছে। কত-কতকাল পরে দেখা হল? বাইশ-তেইশ বছর তো বটেই।

চায়ে চুমুক দিচ্ছে দুজনে। কোনও কথা নেই। কীভাবে যে কথা আবার শুরু হবে, কেউই বোধহয় বুঝতে পারছে না।

কাপটা নামিয়ে রেখে অতীন আস্তে-আস্তে বলল, 'কতগুলো বছর চলে গেল! সুকান্ত, তোকে যদি ওদের কথা জিগ্যেস করি, ত-তুই কি রেগে যাবি? ইনফ্যাক্ট, সেজন্যেই তার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম। হয়ত উচিত নয়...তবু...দেখা যখন হয়ে গেল...'

'না-না, তুই বল না, কী জানতে চাইছিস? টাইম ইজ দ্য বেস্ট হিলার। ক্ষত শুকিয়ে দেয়, রাগ-দু:খ ভুলিয়ে দেয়...বরং সুখস্মৃতিগুলো তখন ভেসে ওঠে। বল অতীন। ডোন্ট হেসিটেট।'

'ওরা কেমন আছে রে?'

'ভালো। ঝিনুক এম.বি.এ. করে একটা মাল্টিন্যাশন্যাল জয়েন করেছে। শর্মি য়ুনিভার্সিটিতে পড়াচ্ছে। এখন প্রফেসর।'...

'বা:!...তোদের নিজেদের আর কোনও ইস্যু—'

'না! ঝিনুক আমারও মেয়ে।'

'ঝিনুক—হ্যাঁ, সে তো বটেই। তোরই তো মেয়ে!'

'অতীন, আমি কিছু মিন করতে চাইনি কিন্তু। ঝিনুককে আমি নিজের মেয়ে ছাড়া অন্য কিছু কখনও ভাবতে পারি নি।'

'কোয়াইট ন্যাচরাল। আমি একটুও মাইন্ড করিনি। চার বছর বয়েস থেকে, তাই বা কেন, ওর জন্মের পর থেকেই তুই যেভাবে ওকে...আচ্ছা, একটা কথা বলব? তখন জিগ্যেস করার সুযোগ ছিল না, ইচ্ছেও ছিল না! তুই হয়ত আমার তখনকার মনের অবস্থাটা এখন কিছুটা বুঝতে পারবি। প্রশ্নের উত্তরটা আমি এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছি। কী এমন হয়েছিল, তোরা ঝিনুককে নিয়ে আমায় ছেড়ে পালিয়ে গেলি? আগে বললি না কেন?'

'কী বলব? বললে তুই মানতিস? তুই কি সত্যিই জানতিস না, শর্মিলাকে আমি কী প্রবলভাবে ভালবাসি? বিয়ে করলাম না, তোদের তিনজনের সঙ্গেই অষ্টপ্রহর পড়ে থাকতাম, এসব সিম্পটম দেখেও তুই কিছু বুঝতে পারিস নি?'

'পেরেছিলাম। পেরেছিলাম বলা ঠিক নয়, আভাস পেয়েছিলাম।' অতীন সিগারেট ধরিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর অন্যমনস্কভাবে বলল, 'সুকান্ত, আমার মাঝে-মাঝে সন্দেহ হয়, আমি কি তাহলে শর্মিলাকে ভালোবাসিনি?'

'তা কেন হবে? অবশ্যই বাসতিস। কিন্তু ঝিনুক জন্মাবার পর থেকেই তুই যেভাবে রিসার্চের নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লি, তাতে শর্মিলা ক্রমশ: ইগনোরড ফিল করছিল। আমি কিন্তু ওর প্রতি আমার টান থেকে তখনও বেরোতে পারিনি, আজও নয়।...এনিওয়ে, তুই এতবচ্ছর প্যারিসে ছিলি। ওখানে তোর কোনও—'

'তুই কি নতুন কোনও অ্যাফেয়ারের কথা বলতে চাইছিস? নারে। চেষ্টা যে করিনি, তা নয়। পারিনি। কোনও মেয়ের প্রতি ফিলিংস এলেই শর্মিলার মুখ ভেসে উঠত। সঙ্গে-সঙ্গে দারুণ অভিমান হত। রাগ হত। আর ঝিনুকের কথা মনে পড়লে...'

অতীনের কথা বন্ধ হয়ে গেল। পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছল।

সুকান্ত চুপ। হঠাৎ বুকের ভেতরে দলা-দলা কষ্ট পাক দিচ্ছে! অতীনের কাঁধে হাত রাখল। বলল, 'অতীন, বিলিভ মি! তোর জন্যে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে রে! তুই আমার কত ছোটবেলার বন্ধু। আমার টাইফয়েড হল। তুই দিনের পর দিন কলেজ না গিয়ে আমার বাড়িতে। ডাক্তার-ওষুধ-ছুটোছুটি! রাত জেগে আমায় পার্ট-ওয়ানে পড়ালি। মেসোমশাই মারা যাওয়ার আগে হসপিটালে আমায় কী বলেছিলেন, তোর মনে আছে?'

অতীন অন্যদিকে তাকিয়ে আছে।

'বলেছিলেন, আমার দুটো ছেলে। একটা অতীন, একটা তুমি। তোমরা কেউ কাউকে ছেড়ো না।...অতীন! আমি তোর সঙ্গে বেইমানি করেছি রে! তুই আমায় ক্ষমা কর প্লিজ!...'

বলতে-বলতে সুকান্ত ছেলেমানুষের মতো ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

'দূর বোকা! জীবনে যা ঘটার তাই ঘটে। কেউ কিছু করে না, আটকাতেও পারে না। আজকাল আমি এটাই বিশ্বাস করি। কুল ডাউন সুকান্ত।'

সুকান্ত চোখ মুছছে আর মাথা ঝাঁকাচ্ছে।

'সুকান্ত, আরেকটা কৌতূহল হচ্ছে। জাস্ট কিউরিওসিটি। উত্তর দেবার হলে দিবি, নতুবা দিবি না।'

'বল না!' সুকান্ত ওর হাত চেপে ধরল, 'প্লিজ বল। নো ফরম্যালিটি অতীন। বিশ্বাস কর, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে রে।'

'ঝিনুক তোকে বাবা বলে?'

'না:! কাকু। শর্মি ওকে তাই শিখিয়েছে।'

অতীন কয়েকসেকেণ্ড থমকাল। তারপর আস্তে-আস্তে বলল, 'আর ওর বাবা?'

'বিদেশে গেছে। ফেরেনি।'

'ঝিনুক বিশ্বাস করে?'

'জানি না রে। আগে মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে কথা বলতে চাইত। এখন বড় হয়ে গেছে। আর চায় না।...অতীন, তুই একবার যাবি আমাদের ফ্ল্যাটে? সল্ট লেকে। চল না রে। আজ সানডে, ঝিনুক, শর্মি বাড়িতেই আছে।'

'পা-গল! কী যে বলিস! হঠাৎ করে তোদের হ্যাপি ফ্যামিলিতে...শর্মিলা নিতে পারবে? ঝিনুক?'

'কেন পারবে না? প্রথমে হয়ত একটু এমব্যারাসড হবে, তারপর কিন্তু শর্মি খুশিই হবে। আর ঝিনুক? আমি সিওর, বাবাকে পেয়ে কাকুকে ভুলেই যাবে।'

'য-যা! তোর সবকিছুতেই বাড়াবাড়ি!' অতীনের ম্লান মুখে আচমকা হাসি ফুটল, 'শর্মিলার সঙ্গে কথা না বলেই এতবড় রিস্ক নিচ্ছিস?'

'হ্যাঁ নিচ্ছি। আমার মানিকজোড়কে বাড়িতে নিয়ে যাব, কাকে ভয়? তাছাড়া, শর্মিকে আমি যেমন চিনি, তুইও কিছু কম চিনিস না। পরশুদিনও আমি লুকিয়ে দেখেছি, ঝিনুকের অন্নপ্রাশনের ছবি দেখতে-দেখতে শর্মি চোখ মুছছিল।...চল! চল! আবার সেই তিনজন প্লাস ঝিনুক! আমাদের হ্যাপী ফ্যামিলি।

জীবনের মানে

আনন্দ। আনন্দ! শুনছ?'

'উঁ?'

'আবার উঁ? মাই গড! সেই সন্ধে থেকে সমানে উঁ-উঁ করে যাচ্ছ, একটা কথার ঠিকঠাক জবাব দিচ্ছ না! কী হয়েছে তোমার বল তো?'

'কী আবার হবে? কিছুই হয়নি। পড়ছি। প্লিজ, বিরক্ত কোরো না।'

'আরে, সেটাই তো জিগ্যেস করছি। সন্ধে থেকে মুখ গুঁজে কী এত পড়ছ? কটা বাজে খেয়াল আছে?'

'কটা?'

'একটা। কাল অফিস-ডে। ভোর পাঁচটায় উঠে পড়তে হবে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। প্রায় শেষ করে এনেছি। তুমি ঘুমিয়ে পড়ো, আমার আর দশমিনিট।'

'কী পড়ছটা কি? খুব দরকারি কিছু?'

'হ্যাঁ।'

খুশি আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না। উঠে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল আনন্দর পড়ার টেবিলের ওপর।

আরে! এ তো বাংলা হরফ। কতকাল পরে দেখছে। নাটক-নভেল মনে হচ্ছে।

'কার লেখা গো?'

আনন্দ সশব্দে ফাইলটা বন্ধ করে দিল। বিরক্ত গলায় বলল, 'শুনে কী হবে?...বললাম তো শেষ করেই শুতে যাচ্ছি। ডিসগাস্টিং।'

খুশির ঠোঁট ফুলে উঠল। বলল, 'আমি তো শুধু জানতে চেয়েছিলাম কী এত মনোযোগ দিয়ে পড়ে যাচ্ছ! সেটুকু জানারও রাইট নেই আমার? অবশ্য...অবশ্য উই আর নট ম্যারেড কাপল...'

এই রে! আনন্দ বিপদ গুনল। তাড়াতাড়ি বলল, 'আরে, তুমি কী থেকে কোথায় নিয়ে ফেলছ! আমি এসব কিছুই মিন করতে চাইনি। তুমি, শুধু তুমি কেন, যে কেউ শুনলে হাসবে, সেই ভয়েই আমি বলতে হেসিটেট করছিলাম। শোন, আমি দুশো বছরের পুরোন বাংলা নভেল পড়ছিলাম। নেট থেকে নামিয়েছিলাম। পড়তে-পড়তে এত অ্যাবসর্বড হয়ে গেছি, ছাড়তে পারছি না।'

'দুশো বছরের পুরোন? বাংলা নভেল? কার লেখা?'

'শরৎচন্দ্র।'

'শরৎচন্দ্র...? ইয়েস, হিস্ট্রি অব বেঙ্গলি লিটারেচারে পড়েছিলাম বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ...বাট দোজ আর অল ট্র্যাশ! ওইসব বস্তাপচা গপ্পো পড়ে সময় নষ্ট করছ?'

'এই তো মুশকিল। এইজন্যেই বলতে চাই নি। আসল ব্যাপারটা হল, আমাদের আজকের লাইফস্টাইলের সঙ্গে ওইসব লেখার কোথাও কোনও মিল নেই! ব্যস, আমরা ওদের গায়ে 'ট্র্যাশ' 'রাবিশ' লেবেল সেঁটে দিয়েছি।'

'হ্যাঁ, তাই তো। ওগুলো পড়ে কি লাভ?'

'রাইট! লাভ কিছুই নেই। আচ্ছা খুশি, জীবনটা কি শুধু লাভলোকসানের ওপর দাঁড়িয়ে আছে?'

'ওরে বাব্বা! তুমি তো, কী বলে যেন, ফিলজফির কথা বলতে শুরু করলে।'

আনন্দ চেয়ারটা ঘুরিয়ে বসল। মুখে অদ্ভুত হাসি, তার মাঝে একটু বিষণ্ণতার ছোঁয়া।

'কী বললে খুশি? ফিলজফি, তাই না? আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবে? বেঁচে থেকে কী লাভ?'

খুশি হকচকিয়ে গেল।

'লাভ! কী বলতে চাইছ?'

'বলছি, আমাদের বেঁচে থেকে কী লাভ?'

'বেঁচে থাকার সঙ্গে লাভ-লোকসানের কি সম্পর্ক? বেঁচে থাকাটাই তো সবচেয়ে বড় লাভ। আমরা আনন্দ করছি, ঘুরছি-ফিরছি, গাইছি-নাচছি, যা চাইছি পাচ্ছি...'

'কোনদিন বুড়ো হব না...মরব না...বলো, বলে যাও! যা চাইছ, পাচ্ছ? ঠিক করে ভেবে বলো।'

খুশি স্থিরচোখে তাকিয়ে থাকে। আনন্দর কথার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছে না। ওর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে হবে?

'তুমি ভাবছ, আমার মাথায় গোলমাল হয়েছে? হা:—! প্লিজ খুশি, আমায় বুঝতে চেষ্টা কর। প্রায় পঞ্চাশ বছর আমরা একভাবে, এইভাবে জীবন কাটাচ্ছি। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি—বয়েস একচুল বাড়েনি। এক রুটিন। সকাল থেকে সন্ধে কাজ, তারপর কোনও ক্লাবে গিয়ে নাচ-হইহুল্লোড়-মদ্যপান, বাড়িতে ফিরে কোনও-কোনওদিন দুজনের শরীর নিয়ে খেলা, শনি-রবি কোনও আউটিং-এ যাওয়া...কোনও নতুনত্ব আছে এত বছরে? কিছু পাওয়ার আছে? কিছু চাওয়ার আছে? কোনও লক্ষ্য আছে? কিচ্ছু নেই। সব ব্ল্যাঙ্ক।'

খুশির সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

আনন্দ থামছে না। বলে যাচ্ছে, 'আমরা মানুষ, খুশি। কিন্তু মানুষের বানানো অ্যান্ড্রয়েডের সঙ্গে আমাদের কোনও তফাৎ আছে? ওদের অনুভূতি আছে, উত্তেজনা আছে, আমাদেরও আছে। ওদের মন নেই। আমাদের? থেকেও নেই। এই যে তুমি-আমি এতগুলো বছর একসঙ্গে কাটিয়ে দিলাম, নেট রেজাল্ট কী? তুমি কি আমায় সত্যি-সত্যি ভালোবাস? আমার জন্যে কি তোমার বুকের মধ্যে কষ্ট হয়, রাগ হয়, দুশ্চিন্তা হয়? হয় না। কারণ এই ফিলিংসগুলো হতে হলে যে-যে ঘটনা ঘটা দরকার, তার কোনটাই নেই। আমাদের শরীর খারাপ হয় না, টাকাপয়সার প্রয়োজন নেই, কোনও দায়িত্ব নেই। দু:খ নেই, তাই সুখ কী জিনিস, জানি না।...এমনকী দ্যাখো, আমাদের পৃথিবীর সব মানুষের দায়িত্ব আমরা তুলে দিয়েছি সেন্ট্রাল কম্পিউটারকে। প্রত্যেকের ঘরে-ঘরে ক্লোজসার্কিট

ক্যামেরা বসানো আছে। কোথাও বিন্দুমাত্র সমস্যা যদি বা হয়, মুহূর্তে খবর চলে যাচ্ছে, কম্পিউটার ব্যবস্থা নিচ্ছে।...এটা কী জীবন, বলো? অসহ্য!'

খুশি কয়েকমুহূর্ত চুপ। তারপর বলল, 'আমার মনে হয় আনন্দ, অনেকদিন আমরা একসঙ্গে রয়েছি তো, তাই তোমার একঘেয়ে লাগছে।...এক কাজ করি, আমরা পার্টনার একসচেঞ্জ করে ফেলি। অ্যাট লিস্ট ফর সাম ডেজ।'

'ধ্যুৎ! বোকা মেয়ে।' আনন্দ ম্লান হাসল। বলল, 'পার্টনার বদলালেই সুখ আসবে? তোমার বদলে যার সঙ্গে থাকব, সেও এই পৃথিবীর মেয়ে। তার শরীর হয়ত আরেকটু সেক্সি, মুখশ্রী আরেকটু ভালো। ব্যস! মনটা তো একইরকম। দু-চারদিন দুজনের শরীর নিয়ে খুব ঘাঁটাঘাঁটি হবে, তারপর যেকে-সেই। খুশি, তোমার বাবা-মার কথা মনে পড়ে?'

'হ্যাঁ। তবে অনেককাল হয়ে গেছে তো, একটু অস্পষ্ট।'

'ছোটবেলা?'

'একটু-একটু। টুকরো-টুকরো স্মৃতি। আস্তে-আস্তে বড় হয়ে উঠছি। বাবা খুব আদর দিত। একটা দাদা ছিল, হয়তো এখনও আছে, কোনও সম্পর্ক নেই...খুব খুনসুটি করত, বাবা বকত, ও মার কাছে নালিশ করত...খুব মজা হতো...তারপর হঠাৎ পরপর বাবা-মা দুজনেই মরে গেল...আমরা খুব কাঁদলাম...একদম অনাথ হয়ে গেলাম...মামা এসে নিয়ে গেল...স্কুল থেকে কলেজে... তারপর...।'

'তারপর?'

'তার কিছুদিন পরেই তো মানুষ ওই আবিষ্কারটা করে ফেলল। মানুষ আর মরবে না।'

'হ্যাঁ, সেইটাই আসলে মৃত্যু হল মানুষের।'

'মৃত্যু হল?'

'হ্যাঁ? গোটা লাইফ সাইকলটাই আটকে দিলাম আমরা। মৃত্যু নেই, তাই কোনও জন্ম নেই। সবাইকে বন্ধ্যা করে দেওয়া হল। যে যেখানে ছিলাম, সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি, দাঁড়িয়ে থাকব। চাইলেও বুড়ো হতে পারব না, মরতে পারব না!

'মরতে চাইবেই বা কেন? এত সুন্দর পৃথিবী, কোনও কষ্ট নেই—'

'ওটাই তো সবচেয়ে বড় কষ্ট। আমাদের কোনও স্বাধীনতা নেই, অন্যরকম কিছু করার ক্ষমতা নেই। মাঝে-মাঝে আমার দমবন্ধ হয়ে আসে। খুশি, যযাতির গল্প জান?

'কে যযাতি?'

'ভারতীয় মহাকাব্য মহাভারতের একজন চরিত্র। কল্পনা না বাস্তব বলতে পারব না। যযাতি চেয়েছিল 'অনন্তযৌবন'। দেবতাদের বরে পেয়েওছিল। তারপরে তার কী করুণ অবস্থা! ঠিক আমাদের মতো। খুশি, তোমার বাচ্চা ভালো লাগে না?'

'হঠাৎ একথা? ভীষণ ভালো লাগে। সিডিতে, টিভিতে দেখি! ফুটফুটে সব বাচ্চা, কী মিষ্টি! জড়িয়ে ধরে খুব চটকাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বাচ্চা পাব কোথায়? পৃথিবীতে এখনও একটাও বাচ্চা নেই।

'তুমি যদি মা হও, তাহলেই বাচ্চা পাবে। তোমার কোলে...তোমার বুকের দুধ খেয়ে একটু-একটু করে বড় হবে... আধো-আধো কথা বলবে...টলমল করে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে—'

'আ: আনন্দ! চুপ করো। তুমি পাগল হয়ে গেছ!'

আনন্দ দেখল, খুশির দুচোখ জলে ভরে উঠেছে।

'আমি একটুও পাগল হইনি খুশি। ঠান্ডা মাথায় কথাগুলো বলছি।'

'আশ্চর্য! তুমি নিজেই এইমাত্র বললে, আমাদের স্টেরাইল করে দেওয়া হয়েছে। বাচ্চার জন্ম দেবার ক্ষমতাই আমাদের নেই। তবু তুমি আমায় মিথ্যে স্বপ্ন—'

'না! মিথ্যে নয়। তুমি শুধু বলো, বাচ্চা চাও কিনা। হ্যাঁ, কি না?

খুশির দুচোখ ক্রমশ বড়-বড় হয়ে উঠল। তারপর অপ্রকৃতিস্থের মতো দৃষ্টি নিয়ে ছুটে এল আনন্দের কাছে।

'চাই! আমি চাই, বাচ্চা চাই! মা হতে চাই!...তোমায় দিতেই হবে।'

দু-হাতে আনন্দকে আঁকড়ে ধরে ঝাঁকাতে লাগল।

ঠিক এইসময় ঘরের অলোগুলো জ্বলতে-নিভতে শুরু করল। চমকে উঠল আনন্দ আর খুশি। একটা বাঁশির মতো শব্দ বেজে উঠল—পিঁ...পিঁ...পিঁ...! ঘরের একদিকে জায়্যান্ট টিভিস্ক্রিনে ফুটে উঠল দুটি শব্দ—'অ্যাটেনশন প্লিজ'!

বাঁশির তীক্ষ্ণ গল্প থেমে গেল। একটা ভরাট ধাতব কণ্ঠ বলে উঠল, 'অনুগ্রহ করে শুনবেন। আপনাদের কী কোনও সমস্যা হয়েছে? আমাদের রাডারে ধরা পড়েছে বিশেষ কম্পন। আপনারা উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। এটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। এত রাতে আপনারা আলো জ্বালিয়ে রেখেছেন। এখনও শুতে যাননি। কোনও সাহায্য চাইলে দয়া

করে জানান। আমরা বিশেষ স্প্রে করে দেব। আপনাদের শরীর শীতল হয়ে যাবে, আপনারা ঘুমিয়ে পড়বেন।'

'না-না।' আনন্দ নিজেকে সামলে নিয়েছে। ওর শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে যাচ্ছে ভয়ের ঠান্ডা স্রোত। ওদের কথা কি রেকর্ড হয়ে গেছে? যাকগে, যা হওয়ার হবে। স্বাভাবিক গলায় বলল, 'আপনি নিশ্চিন্ত হোন। আমরা সমস্যা মিটিয়ে নিয়েছি। এখনই আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ব।'

'ধন্যবাদ।' স্ক্রিন মুছে গেল।

প্রায় ছুটে গিয়ে সবক'টা আলো নিভিয়ে দিল খুশি। আনন্দ ততক্ষণে লম্বা হয়ে পড়েছে বিছানায়।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে আনন্দ অনুভব করল, খুশি তার শরীরে ঘন হয়ে এসেছে। কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'এবার কী হবে?'

ভয়ে তার গলা কাঁপছে।

আনন্দ বলল, 'কিছুই হবে না। কিছু হওয়ার সুযোগ কাউকে আমরা দেব না। অন্ধকার থাকতে-থাকতেই আমরা পালিয়ে যাব! দূরে...অনেক দূরে। সকালের আগে কম্পিউটার চেকিং হয় না।

'কোথায় যাব?'

'হিমালয়ের কোনও ঘন জঙ্গলে ঘেরা উপত্যকায়। ওখানে এখনও আসল প্রকৃতি বেঁচে আছে। সত্যিকারের গাছ, ফুল, পাখি, ঝরনা। আমাদের এয়ার-ট্যাক্সিতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ওরকম কোনও জায়গা ঠিক খুঁজে নেব। তুমি ঘাবড়িও না খুশি, আমি তো আছি।..এখন, এই যে তুমি আমায় আঁকড়ে ধরেছ, এটাই তো ভালোবাসা। আমি কি তোমায় ছাড়তে পারি? ওরা কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না।...

'তারপর? ওখানে গিয়ে থাকব কোথায়?'

'কেন, প্রকৃতির মাঝে, পাহাড়ে গুহায়। ফলমুল, সবজি পুড়িয়ে খাব। কেমন আনন্দ হবে, ভাব? আমি তোমার পাশে থাকব। তুমি আমি দুজনে রাঁধব, খাব।'

খুশির শরীর মিশে গেছে আনন্দর শরীরে। দুটো শরীর কাঁপছে থরথর করে।

'তারপর? আমাদের বাচ্চা?'

'হবে, নিশ্চয়ই হবে। তোমায় এবার বলি, আজই আমি হেলথ পয়েন্ট থেকে স্টেরিলাইজেশনের অ্যান্টিডোট চুরি করে এনেছি। কাচের বেলজারে রাখা ছিল। ইঞ্জেকশন-অ্যাম্পিউল সব রয়েছে। ওখানে পৌঁছেই ইঞ্জেকশন পুশ করব। তারপর— তারপর—'

'তারপর? থামলে কেন, বলো।'

'তারপর সত্যিকারের ভালোবাসব। একবুক ভালোবাসা নিয়ে দুজন দুজনকে আদরে ভরিয়ে দেব। আমাদের বাচ্চা আসবে তোমার শরীরে।...আমরা নিশ্চয়ই পারব খুশি। আমাদের বেঁচে থাকার মানে নিজেরাই খুঁজে নেব।'